শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী

॥ প্রকাশক ॥

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়দাস।

১১/১, গোরাচাঁদ লেন, কলিকাতা-১৪

প্রথম সংস্করণ

চৈত্র—সন ১৩৫৯

দ্বিতীয় সংস্করণ

আষাঢ়—সন ১৩৬৩

॥ মুদ্রক ॥

শ্রীকানাইলাল চক্রবর্ত্তী

দীপক প্রিন্‌টিং ওয়ার্কস,

৯৩/৩/১, বৈঠকখানা রোড,

কলিকাতা-৯

॥ প্রচ্ছদপটের ব্লক নিৰ্ম্মাতা ॥

হিন্দুস্থান আর্ট-প্রিন্‌টিং ওয়ার্কস

কলিকাতা।

দক্ষিণা :—দেড়টাকা মাত্র।

॥ আর্টিষ্ট ॥

শ্রীঅমিয় কুমার সাহা

১৭/৩, কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীবিপুল সেন

সোদপুর।

যাজন পথে

(পাবনা-সৎসঙ্গের আদি-ইতিবৃত্ত)

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় সংস্করণ—সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

তাঁরই বার্ত্তাবহ—

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রণীত

শ্রীঅনুকুলাব্দ—৬৯

বঙ্গাব্দ—১৩৬৩

ইং—১৯৫৬

শ্রীব্রজগোপাল দত্তরায় এম-এ বি-এল (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র নামক পুস্তকের গ্রন্থকার), তজ্জন্য তাহাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছি।

পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য যাহাতে ত্বরায় নিষ্পন্ন হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে যে সমস্ত সহৃদয় সৎসঙ্গী ভাই ও মায়েরা অগ্রিম দক্ষিণা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের প্রতিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আত্মনিবেদনের সর্ব্বশেষে সর্ব্বান্তঃকরণে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি—প্রকাশক শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়দাস—সহপ্রতিঋত্বিক, শ্রদ্ধেয় শ্রীমধুসূদন সান্যাল প্রতিঋত্বিক ও নিশিকান্ত সোম এম-এ প্রফেসারের প্রতি। ইঁহাদের সদিচ্ছাপূর্ণ আন্তরিক সহায়তা পাইয়াছিলাম বলিয়াই নির্দ্দেশিত সময়ের পূর্ব্বক্ষণে এই বই বাহির হইয়াছিল।

সৎসঙ্গ ক্যাম্প—দেওঘর, দোলপূর্ণিমা-১৩৫৭। গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন—

যাজন পথে কেন লিখিলাম ? * * *

তা' ১৩৫০ সনের ফাল্গুন মাসের কথা—মাতৃমন্দিরের উত্তরপার্শে খালি জায়গায় ছোট বেঞ্চের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর উপবিষ্ট। তখন বেলা প্রায় ৯টা। নানা কথাবার্ত্তা চলছে। ইহারই মধ্য দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ইতিবৃত্ত থাকা খুবই ভাল, তা' ভবিষ্যৎ কর্ম্মীদের পথের আলো।" অতঃপর কিছুক্ষণ এদিক ওদিক চেয়ে আমাকে লক্ষ্য করে লেখার কথা বললেন। আর এই প্রকার বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বিশেষ ক'রে তিনি তখন বুঝিয়ে দিলেন। উত্তরে আমি এই নিবেদন করলাম—"আমি সাহিত্যিকও নই, লেখকও নই, আমাদ্বারা একাজ কি ক'রে সম্ভব?" "লেগে গেলেই হ'য়ে যাবে।"—ইঙ্গিত করেই শ্রীশ্রীঠাকুর এ প্রসঙ্গ শেষ করিলেন।

---

* এই প্রবন্ধের সমগ্র বিষয়বস্তু ১৩৬২ সনের আলোচনা পত্রিকার আষাঢ়ের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সংখ্যার পুস্তক পরিচয় মধ্যে উহা দেখিতে পাইবেন।

গ্রন্থকারের আত্মনিবেদন

প্রথম সংস্করণ

পাবনা জেলাস্থিত হিমাইতপুর সৎসঙ্গের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ভাবধারা ও পরিকল্পনার প্রাথমিক বিস্তার, ভবিষ্যৎ-কর্মক্ষেত্র-প্রস্তুতি, নানাস্থানে শাখা-সৎসঙ্গ স্থাপন ও অধিবেশনকেন্দ্র উদ্বোধন, সংগঠনকার্য্য, কর্ম্মিসংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় সমন্বিত আদি-ইতিবৃত্ত—**যাজন পথে**।

এই পুস্তক ইতিবৃত্ত হইলেও আধুনিক প্রচলিত ইতিহাসের কলানৈপুণ্যের কোন পরিবেশন ইহার মধ্যে নাই। পারম্পরিক ঘটনা সমূহের অবিকল চিত্র সহজ মনের সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে মাত্র। কোন কোন ঘটনার মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করিলে তন্মধ্যে অতিমানবীয়ত্বের আংশিক রেখাপাত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাওয়া যাইবে—ইহাও অসম্বদ্ধ উক্তি নহে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আমার সর্ব্বপ্রথম যোগসূত্র সংঘটিত হয় কুষ্টিয়া। ইহার তিন সপ্তাহ পরেই আমি হিমাইতপুর আশ্রমে যাই। পূর্ণ দুই সপ্তাহকাল সেই যাত্রা তথায় ছিলাম। ঐ সময়েই শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বতঃ আদেশ আমার প্রতি—দেশে-বিদেশে সৎসঙ্গের ভাবধারা বিস্তারপূর্ব্বক জাতিবর্ণ-ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বিচারে "নাম" দেওয়া আর তৎসহ স্থানে স্থানে অধিবেশনকেন্দ্রের উদ্বোধন করা। উল্লিখিত সময়ে আশ্রমে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে অনেক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাও এই পুস্তকের একাংশ।

যাজনপথে পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ঐ সমস্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিসহ সমগ্র ঢাকা জেলার ও ময়মনসিংহ জেলার কতিপয় স্থানের কার্য্য-বিবরণী আছে। ময়মনসিংহ জেলার অপরাপর স্থানের কার্য্য-বিবরণী সহ বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার, আসামের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং সমগ্র

বঙ্গদেশের যাজন বৃত্তান্ত দ্বিতীয় খণ্ডে, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যাবধি ভাবসমাধিকাল পর্য্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ যে সমস্ত ঘটনা তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবৃতিসহ সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের স্বল্পবিস্তর পরিচিতি তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকন্তু দেশেবিদেশে কার্য্য বিস্তারকালে কাহার সাহায্যে কোথায় কি কার্য্য হইয়াছিল, আশ্রমের প্রারম্ভ অবধি প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কে কোন্ বিভাগে ইষ্টার্থী হইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় যতদূর সম্ভব এই ইতিবৃত্তে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ অবধি বাং ১৩২৭-৬২ সন পর্য্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চত্রিশ বৎসরকাল ব্যাপিয়া সংকৃত যাজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকের প্রধান বিষয়বস্তু। সন-তারিখ যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া ও স্বীয় স্মৃতি হইতে লেখা হইয়াছে। এই ইতিবৃত্তের সত্যতা সম্বন্ধে সম্যক্ প্রমাণ আমি নিজে, আর যাহারা আমার কার্য্যের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত ছিলেন— তাঁহারা।

এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় হস্তলিপি নিজেই লিখিয়াছিলাম। তৃতীয় হস্তলিপি প্রস্তুতির সময়ে অন্যের সাহায্য নিতে হইয়াছিল। বয়সাধিক্যহেতু কিছুক্ষণ লিখিলেই চক্ষু ঘোলা হইয়া যায়, হাত অচল হইয়া আসে, সঙ্গে সঙ্গে অবসন্নতা আছেই; তাহার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিয়া ও তৎসহ চিন্তা করিয়া প্রতিলিপি করা আরো দুরূহ ব্যাপার। তাই কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই কাজ শেষ করিতে হইয়াছিল। আমার লেখা সমাপ্ত হওয়ার পরে প্রথম খণ্ডের কতিপয় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি করিয়াছিলেন সঙ্ঘভ্রাতা শ্রদ্ধেয় আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তৃতীয় খণ্ডের প্রতিলিপির কতিপয় পৃষ্ঠা করিয়াছিল শ্রীমান্ জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি-এ। এই জন্য উভয়কে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি। সমগ্র পুস্তকের অবশিষ্ট প্রতিলিপি করিয়া দিয়াছিলেন শ্রীমতি বীনাপাণী বৈশ্যরায়। অকুণ্ঠিত চিত্তে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, অসীম ধৈর্য্যের সহিত আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত বীণা-মা এই কার্য্য করিয়াছিলেন।

প্রথম খণ্ডের কতিপয় পৃষ্ঠার প্রতিলিপি করার পরেই আশুদাকে নিজের বৈষয়িক 'প্রয়োজনে সহসা দেওঘর হইতে তাহার কার্য্যস্থলে চলিয়া যাইতে হইল। ইহাতে বড়ই নিরাশ হইয়া হইয়া পড়িলাম। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার বৈদ্যরায় দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়া রেঙ্গুন হইতে দেওঘর আসেন। এই সুযোগ নেওয়ার জন্য তখন তাহাকে ধরিলাম। তাহাতে ডাঃ বৈদ্যরায় বলিলেন—নিজের হাতের লেখা ভাল নয়, স্ত্রী-বীণা ম্যাট্রিক পাশ, হাতের লেখাও সুন্দর, তাহাদ্বারা এই কাজ হওয়া বরং সহজ। ডাঃ বৈদ্যরায়ের স্বেচ্ছায় এই স্বীকৃতির হেতু আছে। সে আর তাহার স্ত্রী উভয়েই আমার নিকট দীক্ষিত। বীণা-মা সন্নিকটেই ছিলেন। সানন্দচিত্তে তখনই সে এই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া নিলেন। দুই তিন দিন পরেই লেখা আরম্ভ হইল। আমি হস্তলিপি দেখিয়া বলিয়া যাইতাম আর বীণা-মা লিখিতেন। এক বা দুই দিনের এই কার্য্য নয়, একাধিক্রমে আড়াই মাসের অধিককাল তাহাকে এই জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতে হইয়াছিল। তাহার দুটী নাবালক ছেলে স্কুলে পড়ে, আর সর্ব্বকনিষ্ঠ কোলের শিশু। অধিকন্তু সমস্ত যোগাযযন্ত্র করিয়া নিজের রান্না করিতে হয়। এই অবস্থায় যথাসময়ে ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া নির্ব্বাহ করিয়া স্কুলে পাঠাইবার ব্যবস্থার পরে তৎপরতার সহিত সংসারের অপরাপর প্রয়োজনগুলি সারিয়া নিয়া এই প্রতিলিপি তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। একটু বিশ্রামের অপেক্ষাও সে রাখে নাই। এই জন্য বীণা-মা আমার কত স্নেহেরপাত্রী ও বাৎসল্যের অধিকারিনী তাহা লেখনীতে প্রকাশ করিবার নয়! প্রেসের জন্যও পৃথক এক কপির প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহাও প্রায় সম্পূর্ণ বীণা-মা করিয়াছিলেন। অতিশয় জরুরী প্রয়োজন হেতু কতিপয় পৃষ্ঠা লিখিয়া দিয়াছিল শ্রীমতী কল্যাণী বসু। কল্যাণীর বাবা ও মা উভয়েই ব্রহ্মদেশে আমার নিকট দীক্ষিত। তাই কল্যাণীও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আগ্রহের সহিত এই কার্য্য করিয়াছিল। এই জন্য শ্রীমতী কল্যাণীও আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদের পাত্রী। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্রদ্ধেয়

ভূমিকা

'সত্যনাম' পরমদয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের পরম মহনীয় দান। এই সত্যনাম-প্রচারের সংক্ষিপ্ত সর্ব্ব আদি ইতিবৃত্ত যাজনপথে পুস্তকের বিষয়বস্তু। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপারকৃপা-লাভে সার্থকজন্মা তাঁরই একনিষ্ঠ সেবক মদীয় ঋত্বিগ্‌দেব শ্রদ্ধেয় শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় এই গ্রন্থের লেখক।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম আত্মপ্রকাশের পর হইতে, তাঁরই প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গ্রন্থকার সারা বাংলার এবং সুদূর আসাম ও ব্রহ্মদেশের নানা জিলায় এবং অসংখ্য পল্লীর আনাচে কানাচে ঘুরিয়া কি ভাবে প্রেমিক নিতাই ঠাকুরের মতো শত লাঞ্ছনা গঞ্জনা অকাতরে সহ্য করিয়া এবং সহস্র বাধাবিঘ্ন হেলায় উপেক্ষা করিয়া 'সত্যনাম' ।বতরণ করিয়াছেন, যাজনপথে তাহারই অপূর্ব্ব কাহিনী। এই গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে গ্রন্থকারের ইষ্টানুরাগ অযুত ধারায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন জনগণের মাঝে পরমপুরুষের পুণ্যনাম-প্রচারকার্য্যে গ্রন্থকার যে বিচিত্র বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, গ্রন্থে তাহা অতি সরল ও উপাদেয় ভাষায় মনোহর ভঙ্গিমায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবন-পথের যাত্রী প্রত্যেকেই এই গ্রন্থ হইতে জ্ঞান ও প্রেরণা লাভে উপকৃত হইবেন সুনিশ্চিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাববার্ত্তা আজ বিশাল ভারত অতিক্রম করিয়া দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, অযুতকণ্ঠে

আজ তাঁহার পুণ্যনাম ধ্বনিত হইতেছে, অগণিত নরনারী তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছে—বিশ্বের এই ঘোর দুর্দ্দিনে তিনি আজ নরকুলের একমাত্র পরমাশ্রয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের সত্যনাম প্রচারের আদি ইতিকথা-সম্বলিত এই গ্রন্থটি যে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববাসীর দরবারে অতি আদরণীয় প্রয়োজনীয় প্রমাণ্য বস্তু বলিয়া আপনযোগ্য আসন অধিকার করিবে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইহার মর্য্যাদার গুরুত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত বিশ্লেষণ বা সমালোচনার অবতারণা করা অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজন। আমি দেখিতেছি, শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার পূজারীর আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্বের মন্দিরে বিশ্বেশ্বরের পূজারতি করিতে তন্ময়চিত্তে লাগিয়া গিয়াছেন। বিশ্বরাটের এই পুণ্যপূজার মঙ্গলদ্রব্যের পূত সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া আর্ত্ত মর্ত্তবাসী দলে দলে জগৎপিতা পরমদয়াল পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যপাদপীঠতলে মিলিত হউক, তাঁরই প্রেমরসে স্নাত হইয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক—দীনাতি-দীনের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। ইতি—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩
বারাসত

বিনীত
শ্রীব্রজগোপাল দত্তরায়

পুস্তক পরিচয়

যাজনপথে সম্পর্কে আলোচনা পত্রিকার মন্তব্য—

যাজনপথে শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী

১ম খণ্ড মূল্য দেড় টাকা মাত্র

লেখক সৎসঙ্গের প্রায় আদিযুগে দীক্ষা নেন এবং তখন থেকেই প্রচারে ব্রতী হন। বাঙলা ও বর্ম্মার বহুস্থানে তিনি যাজন করেছেন এবং বহু ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়েছেন। সেই সব ঘটনা থেকে সৎসঙ্গের আদিইতিবৃত্ত অনেকটা জানা যায়। সেইদিক থেকে বইখানির উপযোগীতা আছে। মুদ্রণকার্য্যে আর একটু মনোযোগী হওয়া উচিৎ ছিল।

আলোচনা পত্রিকা—বৈশাখ—১৩৬০ সন।

যাজনপথে শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী

২য় খণ্ড প্রাপ্তিস্থান সৎসঙ্গ ক্যাম্প

সমগ্র পুস্তক তিন খণ্ডে প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। লেখক সৎসঙ্গের প্রায় আদি যুগে আসেন। সেই সময় থেকে সৎসঙ্গের ভাবধারা প্রচারে তাঁর নানাস্থানের কর্ম্মের বিবরণ থাকায় সৎসঙ্গের নানা প্রতিষ্ঠানের এবং ব্যক্তি পরিচয় প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়েছে। এই ভাবে তখনকার যাজনার ইতিবৃত্তের সাথে সৎসঙ্গেরও কিছু অতীত ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। আলোচনা পত্রিকা—শ্রাবণ—১৩৬০ সন।
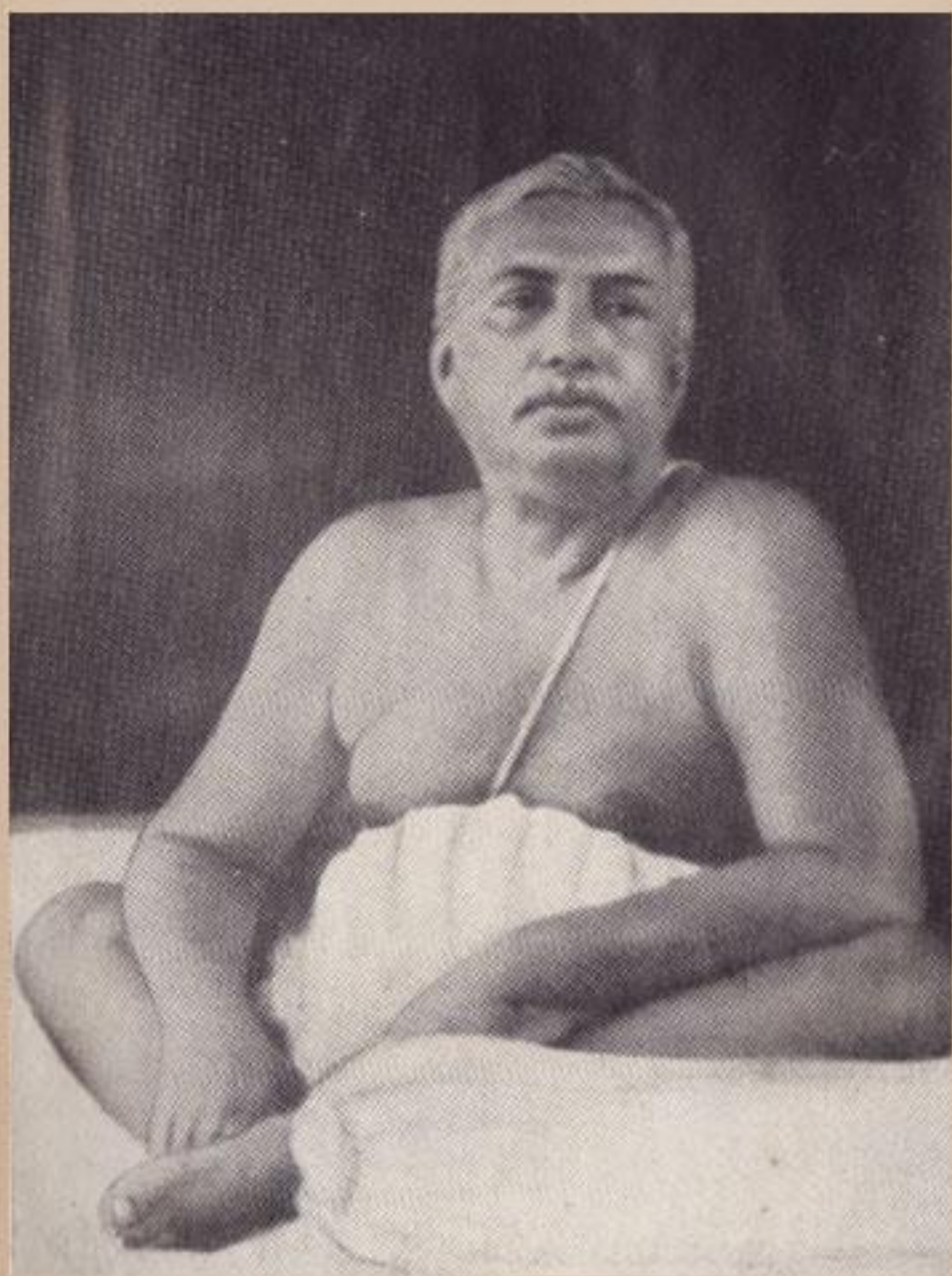
গ্রন্থারম্ভে স্বস্তিবাচন

তমসার পার
অচ্ছেদ্যবর্ণ
মহান্ পুরুষ
ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত।

যদ্বিদাচরণে
তদুপাসনাতেই
ব্রতী হই!
— জাগ্রত হও,
আগমন কর—
আমরা যেন একেই অভিগমন করি,
এক উদ্দেশ্যেই বাক্ কর্ম্ম বিনিয়োগ করি,
একনিরন্তরতায়
সেই তাঁকেই যেন জানিতে পারি;
শ্রদ্ধানুসৃত—
আপূর্য্যমান
ইষ্টৈক প্রাণনায়
একই মন্ত্রে একই মননে
সমষ্টি-উৎসারণায়
বৈশিষ্ট্যপূরণী একচেতনাভিমন্ত্রণে
শিষ্ট হবিঃ ও শ্রেষ্ঠ হবনায়
সমান আকূতি ও সম্যক্ হৃদয়ে
জীবন-বর্দ্ধনে
ঋদ্ধিমান্ হই!

স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

ভারতের অবনতি (Degeneration) তখন থেকেই আরম্ভ হ'য়েছে যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত্ত ভগবান অসীম হ'য়ে উঠেছে—ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের উপাসনা আরম্ভ হ'য়েছে।

ভারত! যদি ভবিষ্যৎ কল্যাণকে আবাহন করিতে চাও, তবে সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও—আর তোমার মূর্ত্ত ও জীবন্তগুরু বা ভগবানে আসক্ত (attached) হও—আর তাদেরই স্বীকার কর, যারা তাঁকে ভালবাসে। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব।

পরিপূরণী বর্ত্তমান মহাপুরুষ পূর্ব্বতনদের অবলম্বন করিয়া বাস্তব প্রাথম্যে জীবনবৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যে চলনায় উদ্বর্দ্ধনশীল—বিবর্ত্তন-বীজ তাঁতেই নিহিত।

পূর্ব্বতনদিগের প্রতিভূ বর্ত্তমান পুরুষোত্তম যিনি—তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ হ'য়ে, ভেদ-দৃষ্টি-সম্ভূত অনুরাগে পূর্ব্বতনদিগকে গ্রহণ ক'রে যারা বিভিন্ন গোষ্ঠির অবতারণা করতে লাগল—তারাই তখন থেকে ঐক্য ও কৃষ্টির সমাধি রচণার সূত্রপাত নিয়ে এল।

আর্য্যনির্দ্দেশই হচ্ছে—

একোমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্

পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্।

মা ম্রিয়স্ব,—মা জহি,—শক্যতে চেৎ

মৃত্যুমবলোপয়।

মরোনা, মেরোনা, যদি পার মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর।

পাকা ইমারত
টিন সেড
পাকা রাস্তা
কাঁচা "
টিউব ওয়েল
পুকুর
পাকা বাঁধ
উ
প
পূ
দ

সৎসঙ্গ পল্লীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। অক্ষয় ভবন
২। শরৎ নিবাস
৩। ঘোষ-বসু বাসভবন
৪। প্রসন্ন নিলয়
৫। রাধাস্বামী আলয়
৬। মনোমোহন কুটীর
৭। পঞ্চানন ভবন
৮।৯।২৪।২৫।২৭।৩৯
শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিবারবর্গের বাস ভবন
১০। রাধাস্বামী ভবন
১১। অনুকূল হোসীয়ারী
১২। ষ্টিম লণ্ড্রী
১৩। বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র দ্বিতীয় ভবন
১৪। কলা ভবন
১৫। কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১৬। রঙ্গমঞ্চ ও সভাগৃহ
১৭। তপোবন বিদ্যালয়
১৮। প্রেস ও পাব্লিশিং বিভাগ
১৯। সেণ্ট্রাল্ অফিস
২০। ওয়ার্কসপ
২১। অতিথি শালা
২২। কুটীর শিল্পালয়
২৩। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরাতন বাসভবন
২৬। ফিলান্থ্রপী কার্য্যালয়
২৮। দাতব্য ঔষধালয়
২৯। ডাকঘর ও ব্যাঙ্ক
৩০। মাতৃমন্দির (দ্বিতল)
৩১। মাতৃদেবীর বাসগৃহ
৩২। পিতৃদেবের বাসগৃহ
৩৩। পিতৃদেবের স্মৃতিমন্দির
৩৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ
৩৫। শ্রীশ্রীঠাকুরের রাত্রেরশয়ন কুটীর
৩৬। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরাহ্নে বিশ্রাম স্থান
৩৭। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিবাভাগের বিশ্রামাগার
৩৮। সৎসঙ্গ পল্লীর দৈনিক বাজার
৪০। ইষ্টভৃতি ভবন

যাজন পথে

প্রথম পর্ব্ব

(১)

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আমার শুভ-সংযোগ ১৩২৭ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার,—ইং ১৯২০ সালের ১৫ই মে। তখন অপরাহ্ণ প্রায় সাড়ে চারিটা। *ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার আমায় নিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়ায় অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস মোক্তারের বাসায় ছিলেন। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুর কখন কখন কুষ্টিয়া আসিতেন এবং ঐ বাসাতেই থাকিতেন। এই দিন মোক্তারবাবু বাসায় ছিলেন না; প্রয়োজন-বশতঃ দেশের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই তখন দেশে ছিল।

---

*ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার "জননী মনোমোহিনী ও শ্রীশ্রীঠাকুর" নামক গ্রন্থের প্রণেতা। যতদূর মনে হয়—১৩৩০—৩১ সন মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত। ডাঃ জোয়ারদার ১৩৫৩ সনের ২১শে শ্রাবণ তারিখে হিমাইতপুর পরলোকগমন করেন। কুষ্টিয়ার পুরাতন সৎসঙ্গীদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম। তথাকার সৎসঙ্গীদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মোক্তার অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, ডাঃ সত্যরঞ্জন দত্ত, ডাঃ গোকুলচন্দ্র মণ্ডল এল এম এস।

এই ঘটনার পূর্ব্বদিন—৩১শে বৈশাখ তারিখে কুষ্টিয়া-হাইস্কুলে আমার এক বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—"জ্ঞান ও সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষ।" স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার একজন। বক্তৃতার পরদিন আমাকে আবার স্কুলে গিয়া প্রাতঃ সাতটা হইতে সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টাকাল মৎপ্রণীত "পাকা-রং-প্রণালী" পুস্তকের কতগুলি প্রকরণ ছাত্রদিগকে হাতেকলমে শিখাইতে হইয়াছিল। অতঃপর ষ্টেশনের সন্নিকটে যে গৃহে ছিলাম স্কুল হইতে তথায় ফিরিয়া আসিলাম। সংকল্প ছিল--চট্টগ্রাম মেইলে রাজবাড়ী গিয়া তথাকার হাইস্কুলে ঐরূপ বক্তৃতা করিব। সেই উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি স্নানের জন্য প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময়ে অপরিচিত এক ব্যক্তি অকস্মাৎ আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। ইনিই পূর্ব্বোক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার।

হোমিও-রিসার্চ্চ-লেবরেটরী নামে আমার একটী দেশীয় ঔষধের কারখানা ছিল। ডাক্তারদিগের সহিত ঐ সমস্ত ঔষধের পরিচয় করান উপলক্ষে বিভিন্ন জেলায় আমাকে যাইতে হইত। ঐ সঙ্গে জীবনের অপর একটি সংকল্পসিদ্ধির পথ উন্মুক্ত হইয়া গেল। পাঠ্যাবস্থায় এই অভিজ্ঞতা হইয়াছিল—আমাদের দেশের বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে এমন

ইহাদের মধ্যে ডাঃ গোকুলচন্দ্র মণ্ডল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রবীণ। শ্রীশ্রীঠাকুর ডাঃ গোকুলচন্দ্র মণ্ডলকে "ডাক্তার বাবা" বলিয়া সম্মানসূচক সম্বোধন করিতেন। দেখিয়াছি—শ্রীশ্রীঠাকুর বা ঠাকুর পরিবার মধ্যে কেহ কখনো অসুস্থ হইলে সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি আশ্রমে চলিয়া আসিতেন। আর সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের তিনি একজন অকপট অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। অতিবৃদ্ধ অবস্থায়ও তিনি প্রত্যেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আশ্রমে আসিতেন—এত প্রবল ছিল তাঁহার ইষ্টানুরক্তি। অল্প কয়েক বৎসর হল তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

কিছুই শিক্ষণীয় বিষয় নাই, যাহার সাহায্যে ছাত্রগণ বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া, চাকুরী ব্যতীত স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিয়া দাঁড়াইতে পারে। বাস্তবিক উদ্ভাবনী—বৃত্তির কোন লক্ষণ তাহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া মনে হয় না। যেখানেই গিয়াছি, দেখিয়াছি—প্রত্যেক হাইস্কুলেই উপরের ক্লাসের অঙ্কের শিক্ষক দিগেরমধ্যে বেশীর ভাগই বিজ্ঞানের ছাত্র—বি, এস্ সি—এম্, এস্ সি। ইহাতে মনে হইত যেন চাকুরীই তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, আর তাহাই তাহাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে।

কৌতূহলোদ্দীপনার মধ্যদিয়া ছাত্রদিগের অন্তরে উদ্ভাবনী-বৃত্তি উদ্রেক করিবার প্রয়াস হইতেই "পাকা-রং-প্রণালী" পুস্তকের প্রণয়ন। আর সেই উদ্দেশ্য হইতেই এই প্রকার বক্তৃতায় আত্মনিয়োগ। প্রকৃতিকে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করতঃ মানুষ সাধারণ অবস্থা হইতে বিপুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধীশ্বর হইয়া কী প্রকারে এত সম্পদশালী হইয়া উঠিল, তাহাই বক্তৃতার মধ্যদিয়া সহজ কথায় ছাত্র দিগের অন্তঃকরণে রেখাপাত করিয়া তোলার চেষ্টা করা হইত। এই কার্য্যে আমার আত্মনিয়োগ সর্ব্বপ্রথম ১৩২২ সনে। তদবধি সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ১৩২৭ সনের বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে পাবনাটাউনে, আর তথা হইতে কুষ্টিয়া আসি। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত শুভ-যোগাযোগ সংঘটনের ইহাই মূলসূত্র।

যাহা বলিতে ছিলাম—ডাক্তার জোয়ারদার প্রকাশ করিলেনযে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে তিনি আসিয়াছেন,—আমাকে নেওয়ার জন্য; তখনই তাহার সাথে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমি শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে তখন জানিতে চাহিলাম। তদুত্তরে স্বল্পকালমধ্যে সংক্ষেপে যাহা সম্ভব তিনি তাহাই বলিলেন। অতঃপর তাহাকে জানান হইল—এখন যে মেইলট্রেন আসিতেছে তাহাতে রাজবাড়ী রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। সুতরাং এই মুহূর্ত্তে কোথাও যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তার

উদয় হইল, যদি এখানে ফিরিয়া আসা না হয়, তাহা হইলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে আর দেখা নাও হইতে পারে। কাজেই এমন সুযোগ ত্যাগ করা কিছুতেই সঙ্গত নয়। বরং রাজবাড়ী যাওয়া বন্ধ করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তখনই ডাঃ জোয়ারদারকে বলা হইল রাজবাড়ী যাওয়া আপাততঃ স্থগিত রহিল, শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে অবশ্য দেখা করিবএখন নয় — অপরাহ্ণে, বেলা হইয়াছে, এখন তাঁহার স্নান-আহার করিবার সময় তাই যাওয়া সঙ্গত মনে করি না। অপরাহ্ণ চারিটায় আপনার বাসায় যাইব, আপনি প্রস্তুত থাকিবেন। আপনার ঠিকানা বলুন। ইত্যবসরে মেইলট্রেন ও আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠিকানা দিয়া ডাক্তার বাবু বিদায় নিলেন।

অপরাহ্ণ ঠিক চারিটায় ডাঃ জোয়ারদারের বাসায় গেলাম। ডাক দেওয়ার সাথে সাথে নীচে আসিয়া আমাকে নিয়া দ্বিতলোপরি এক কক্ষে গেলেন। তথায় বসাইয়া "পুণ্যপুঁথি" (শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাভাববাণী) হইতে কিছু পড়িয়া শোনাইলেন। ইহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো দেখাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। জীবন্ত মানুষের কাছে যাইতেছি, ফটো দেখার প্রয়োজন করে না, এখন চলুন গন্তব্য স্থানে যাই বলিয়াই আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম ডাঃ জোয়ারদার অগত্যা আমাকে নিয়া অশ্বিনীদা'র বাসার দিকে চলিলেন। তথায় গিয়াই সরাসরি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম — কক্ষমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর উপবিষ্ট। অন্য কেহ তথায় ছিলনা। ডাঃ জোয়ারদার আমার পরিচয় দিলেন। দণ্ডায়মান অবস্থায়ই আমি মুহূর্ত্তমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের আপাদ মস্তক সম্পূর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া নিলাম ; দর্শনমাত্র মনে হইল—এমন দ্বিতীয়টি আর কোথাও দেখি নাই !

"দা"—এই সম্বোধনে শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বসিতে বলিলেন। আমিও প্রণাম করিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট হইলাম। ডাঃ জোয়ারদারও একপার্শ্বে বসিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরকে উদ্দেশ্য করিয়া আমি বলিতে থাকিলাম— সংসারের ভেতর থেকে ভগবান চাই, পিতামাতা-স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ ক'রে

পাহাড়ে জঙ্গলে চ'লে যাওয়া, শীততাপে কষ্ট পাওয়া কিংবা বিকর্ম্মা ভবঘুরে সে'জে দেশদেশান্তরে উদ্দেশ্য-বিহীন -পর্যটন এমন ইচ্ছাও আমার নাই, পুরক-কুম্ভক কসরৎ ক'রে শেষকালে হাঁপানী-যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে থাকা এমনও—আমি চাই না। ভাবাতীত-বোধাতীত-সাড়াহীন-নিনড় যদি ভগবান হ'ন—তাঁকে পেয়ে লাভ কি? তা'হলে দালানের এই Wall সব চেয়ে বড় ভগবান! আমি চাই কর্ম্মময় মানুষ ভগবান! যিনি প্রতিকর্ম্মে আমাকে হাত ধ'রে চালিয়ে নেবেন, যেমন হনুমানের শ্রীরামচন্দ্র, অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ, অন্ততঃ শ্রীমৎ বিবেকানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণদেব—এমন একজন। পিতামাতা-স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-পরিবেশের মধ্যে থেকে আমার ভগবান পাওয়া চাই। অনেকেই এই স্থলে প্রশ্ন করিতে পারেন—অকস্মাৎ দেখা হওয়ার সাথেই এত কথা বলার প্রয়োজন কী ছিল? তাই আগেই বলিয়া রাখিতেছি—ডাঃ জোয়ারদার প্রথম আলপনই করিয়াছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ভগবত্তা ও ঐশী-শক্তির বিষয় নিয়া। আমারও সেই আবেগ-উদ্বেলনা হইতে তখন এই সমস্ত কথার অবতারণা।

সোৎফুল্ল হাসিমুখে তখনই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন—"আমারও সংসারী সন্ন্যাসী চাই, দা! জঙ্গলের সন্ন্যাসী চাই না—নিতাই চাই; সন্ন্যাস মনে—বনে যাওয়া নয়কো; ইষ্টযুক্ত কর্ম্মই সন্ন্যাস! ভগবান পে'তে পাহাড়ে, জঙ্গলে যাওয়ার প্রয়োজন কি? কসরতেরই বা প্রয়োজন কি? তিনি—আপনার কাছেই, Screen (পর্দ্দাখানা) একবার খুলে গেলেই হয়। এখানেই আমার প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল।

এই সময়ে অকস্মাৎ এক ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কতগুলি লিচু শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া বিনয়ের সহিত বলিলেন—বছরের নতুন ফল সবে মাত্র পেয়েছি, তাই আপনার জন্য নিয়ে আসা। অত:পর তিনি চলিয়া গেলেন। ঐ লিচু হইতে প্রায় অর্দ্ধপরিমাণ শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহস্তে আমাকে দিলেন। আমি ফলগুলি পকেটের মধ্যে রাখিলাম। তাঁহার ইচ্ছা ওখানেই আমি ফলগুলি খাই,

তাই যেন তিনি অবশিষ্ট লিচু হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিতে থাকিলেন, তদৃষ্টে আমিও পকেট হইতে লিচু বাহির করিয়া খাইতে লাগিলাম। ইত্যবসরে শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ ঘর হইতে বারান্দার দিকে চলিয়া গেলেন। আমি গৃহ মধ্যেই রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে বাহির দিক হইতে "দা" এই আওয়াজ শুনিতে পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ জোয়ারদার ভিতরে আসিয়া জানাইলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে ডাকিয়াছেন। আমিও তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া আসিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে হাত-মুখ ধোয়ার কথা বলিলেন। সেই উদ্দেশ্যে আমি কুয়ার দিকে যাইতেছিলাম, অমনি তিনি আমাকে ডাকিলেন; নিকটে যাওয়া মাত্র নিজে পাত্র ধরিয়া জল ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। আমি সঙ্কোচের সহিত বলিলাম—নিজেই জল ঢেলে নেব। তখন অতিমধুরভাবসমন্বিত কোমলকণ্ঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যক্ত করিলেন—আপনার নিজের লওয়াও যা, আমার দেয়াও তাই। অপরের সহিত তাঁহার কত গভীর আত্মবোধ এই কয়টি শব্দের মধ্যে তাহা রূপায়িত আছে। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যতীত উহা অপরের অনধিগম্য। অগত্যা তাঁহারই ইচ্ছা রক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি জল ঢালিতে লাগিলেন, আমি হাত-মুখ ধুইতে থাকিলাম, তদবস্থায় তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই বাণী হইল—"আপনি করিয়ে সেবা অপরে করায়।" সেইদিন সেইমুহূর্তে এই শিক্ষা পাইলাম—আগে নিজে সেবাপরায়ণ হইতে হয়, তারপরে অপরকে সেবার উপদেশ দেওয়ার অধিকার জন্মে, তদন্যথা ঐ প্রকার উপদেশ নিষ্ফল বাগাড়ম্বর মাত্র। পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সেবা সম্পর্কে বিশেষ করিয়া যাহা বলিয়াছেন নিম্নে দেওয়া গেল—

কথার সেবায় অভীষ্ট তোর
পূরবে নাকো ঠিক জানিস
বাঞ্ছাপূরক দায়িত্বচাপ
শক্তি বাড়ায় ঠিক মানিস। (অনুশ্রুতি)

অনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও ইঙ্গিত অনুসারে তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিলাম। অকস্মাৎ তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া নিয়া, অতিশয় আবদারের সহিত মুখমণ্ডলে মুহুর্মুহু চুম্বন আর নাসিকাগ্রদ্বারা কপোলদেশ পুনঃ পুনঃ স্পর্শন করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে হারান সন্তানকে পাইয়া স্নেহময়ী জননী যেরূপ আকুল-উন্মাদনাসহ আলিঙ্গিত হইয়া থাকে, কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, শ্রীশ্রীঠাকুরও আমাকে নিয়া তেমনিভাবে রহিলেন। তন্মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া অপরিসীম আনন্দের অভূতপূর্ব্ব এক অন্তঃপ্রবাহ ছুটিতে থাকিল, আর আমি তাঁহার মহা মহিমভাবে মগ্ন হইয়া রহিলাম। ইত্যবসরে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমুখখানা আমার কাণের অতিশয় নিকটে রাখিয়া কয়েকবার "নাম" শোনাইলেন। ন্যূনাধিক দশ কি বার মিনিটকাল তাঁহার শ্রীঅঙ্গে আমাকে এই ভাবে রাখিয়া ছিলেন। তদবস্থায় তাঁহার প্রচুর স্বেদ নির্গত হইতে ছিল। আমি একটু প্রকৃতিস্থ হইবার পরেই আমার অনুনয় ও প্রার্থনা মতে তিনি আমাকে কোল হইতে নামাইয়া উভয় হাঁটুর মধ্যস্থলে রাখিলেন আর ভুজযুগলদ্বারা আমার দেহ বেষ্টন করিয়া থাকিলেন।

অতঃপর শব্দতত্ত্ব নিয়া যে ভাবে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন তাহাতে আমার মনে হইল কুষ্টিয়া-হাইস্কুলে পূর্ব্বদিন যে বক্তৃতা হইয়াছিল তাহার সমর্থন করিয়াই যেন তিনি ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। অবশ্য পরে ডাঃ জোয়ারদার হইতে ইহাও আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু নিয়া তিনি আগেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। আমার বক্তৃতার মধ্যে শব্দতত্ত্ব ছিল।—

"ছন্দোভ্যঃ প্রথমমেতদ্বিশ্বং বিবর্ত্তিতং।" (বাক্যপদীয়)

শব্দ-তরঙ্গ হইতে যে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি—বেদের এই শ্লোক উল্লেখ করিয়া প্রমাণিত করা হইয়াছিল ভারতীয় দ্রষ্টাপুরুষগণ বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বেই নাদানুসন্ধান পূর্ব্বক সৃষ্টিতত্ত্বের এই মহান্ সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন।

শব্দ-বিষয়ক আলোচনার মধ্যদিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর তখন ঐ তথ্য আরো স্পষ্টতরভাবে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। অধিকন্তু, তৎসহ এই কথাও বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সাধনাদ্বারা অগ্রসর হইলে এই শব্দ মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত আলোচনার সময়ে ডাঃ জোয়ারদার নিকটে ছিলেন—অন্য কেহ ছিল না। আলাপ-আলোচনায় রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। তখন আমি বিদায় চাহিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ওখানে রাত্রিতে খাওয়া ও থাকার কথা বলিলেন। তাহাতে আমি জানাইলাম—বাসা হইতে খাওয়াদাওয়া সারিয়া আসিয়া রাত্রিতে থাকিব। এই বলিয়া আমি রওনা হইতেই তিনি আবার আমাকে ডাকিয়া নিকটে নিলেন আর বলিয়া দিলেন—"মাছ মাংস না খাওয়াই ভাল।"

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ তদ্ভাবাপন্ন অবস্থায়। আমার সহকর্মী শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী তামাকু সেবন করিতে ছিলেন। আমি উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি সঙ্কোচের সহিত জানাইলেন—ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাই আগেই খাইয়াছেন। আমার খাওয়ার সবই ঠিক ছিল। মাছ, ডাল, ভাজি কিছুই গ্রহণ করিলাম না, কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় অন্ন দুধের সহিত কোন প্রকারে উদরস্থ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে অশ্বিনীদার বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। ঐদিন হইতেই আমিষ খাওয়া সম্পূর্ণ ত্যাগ। আর তদবধি এই পর্য্যন্ত কেবল নিরামিষের উপর চলিয়াছি।

অশ্বিনীদার বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম পূর্ব্বকথিত প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরেই শ্রীশ্রীঠাকুর শায়িত অবস্থায় আছেন। দেখিয়াই তিনি অতিশয় উৎসাহের সহিত আমাকে শয্যার একপার্শ্বে বসিতে বলিলেন। উপবেশনান্তে আমি বলিলাম শু'নেছি পরশমণির স্পর্শে লোহা সোণা হয়, আর সদ্গুরুর স্পর্শ পেলে মানুষ পবিত্র হয়; আজ আপনার সাথে এক শয্যায় থাক্‌বো তা'তে যদি চিত্তশুদ্ধি হয়, তা' হ'লে বুঝ্‌তে পারবো ইহার সত্যতা শ্রীশ্রীঠাকুর ঈষৎ হাসিলেন। ডাঃ জোয়ারদার আমাকে ডাকিয়া নিয়া একটু দূরে

গিয়া বলিলেন—এই প্রকার কোন ইচ্ছা প্রকাশ করা ঠিক নয়। তাহার কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া তখনই আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিলাম। তিনি কিঞ্চিন্মাত্র অপেক্ষা না করিয়া কোলের বালিশটী অপরদিকে রাখিয়া সেই স্থানে আমাকে শোয়াইয়া ফেলিলেন। অনন্তর স্কন্ধোপরি বাম হাতখানা রাখিয়া, শায়িত থাকিয়াই কথাবার্ত্তা বলিতে থাকিলেন। আবার পূর্ব্ববৎ আলোচনা চলিল। উদ্ভিদজগতে cross-breeding দ্বারা যে অসংখ্য নূতন সৃষ্টি হইতে পারে সেই বিষয় নিয়াই তখন অধিক কথা হইল। এই প্রকার আলোচনায় রাত্রি এগারটা বাজিয়া গেল। এই সময়ে একজন আসিয়া খাওয়ার কথা বলিলেন। আমাকে ঐঘরে ঐ বিছানায় শুইয়া থাকার নির্দ্দেশ দিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আহার করিতে গেলেন। এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম তিনি যে বাঞ্ছাপূরক ও অন্তর্য্যামী। এই সম্পর্কে পরবর্ত্তীকালের একটি ঘটনা নিম্নে দেওয়া হইল। *

---

* এই ঘটনা ১৩৩২ সনের। ব্রহ্মদেশে যাজনে নিযুক্ত থাকা কালে একসময়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়ি। শেষকালে নিরুপায় হইয়া দেশে চলিয়া আসি। এইজন্য আমাকে অনেকদিন আশ্রমে থাকিতে হইয়াছিল। এই অবস্থায় একদিন আমার বেদানা খাওয়ার তীব্র আকাঙ্খা হয়। পাবনাসহর হইতে বেদানা আনার জন্য অনেকের কাছে বলা হইল কিন্তু বাজারে যাইবে এমন কোন লোক পাওয়া গেলনা। ঐ সময়ে পেগুর উকীল নৃপেন্দ্রকুমার মিত্র সস্ত্রীক আশ্রমে ছিলেন। তাহার সাথে ভৃত্য ও পাচক দুই ছিল। মিত্রদা বাবার কটেজে ছিলেন। অগত্যা সেখানে গিয়া তাহাকে বেদানার কথা জানাইলাম। তিনি ও তাহার স্ত্রী উভয়েই ব্রহ্মদেশে আমার নিকট হইতে "নাম" নিয়াছিলেন। এই সূত্রেই তাহার সহিত আমার বিশেষ সম্পর্ক।

দালানের বারান্দায়ই শ্রীশ্রীঠাকুর আহার করিতে বসিলেন। পরস্পর কথাবার্তা হইতে বুঝা গেল তথায় কয়েকজন ভক্ত আসিয়াছেন। ক্রমেই সংখ্যা বৃদ্ধি, কণ্ঠস্বর হইতে ইহাও বুঝা গেল যে তন্মধ্যে মায়েরাও আছেন। প্রশ্ন, উত্তর, হাস্যরস সবই হইতেছে। শায়িত অবস্থায় উৎকর্ণ হইয়া আমিও শুনিতেছি। এই প্রকার অভিনয়ের মধ্যদিয়া রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। তখন সব নিস্তব্ধ। তাহাতে বুঝিতে পারিলাম সকলেই চলিয়া গিয়াছেন আর শ্রীশ্রীঠাকুরও শয়ন করিয়াছেন।

তাই তিনি নিজেই আগ্রহ করিয়া চাকরকে বেদানা আনার কথা বার বার বলিয়াও দিলেন। সময়ের এমনই ফের যে ভৃত্যও বাজারে গিয়া বেদানার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ইহাতে অস্বস্তি আরো বৃদ্ধি পাইল। সারাদিন বেদানা খাওয়ার একটা তৃষ্ণা লাগিয়াই রহিল। একটু স্থির হইবার জন্য অবশেষে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই পদ্মাতীরে আশ্রমের বাঁধের উপর পদ্মারতীরে গিয়া পা-চারি করিতে থাকিলাম। অকস্মাৎ মায়ের কটেজ হইতে শ্রীশ্রীঠাকু আমাকে ডাকিলেন। নিকটে যাওয়া মাত্র তিনি আমার হাতে প্রচুর পরিমাণ বেদানার কোষ দিলেন আর ওখানেই বসিয়া খাওয়ার কথা বলিলেন। আকাঙ্খিত বেদানা এই প্রকার অপ্রত্যাশিতভাবে পাইয়া আমিও অতিশয় পরিতৃপ্ত হইলাম। বেদানা খাওয়া হইলে পরে আবার বাঁধের উপর আসিয়া পা-চারি করিতে থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর পুনর্ব্বার আমাকে ডাকিয়া নিলেন। এইবার আমার হাতে দুইটি সুবৃহৎ রাজভোগ দিলেন। ইহাও ওখানেই বসিয়া খাইলাম। এমন সময়ে মাতৃমন্দিরে সৎসঙ্গের প্রার্থনার আওয়াজ শোনা গেল। তখন আমি সেখানে চলিয়া গেলাম। আমারও তথায় যাওয়া আর প্রার্থনার শেষ। ওখানে গিয়াও দেখিলাম প্রচুর বেদনার ভোগ। আর আশ্রমের প্রাচীনতম সৎসঙ্গী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৌরহিত্য
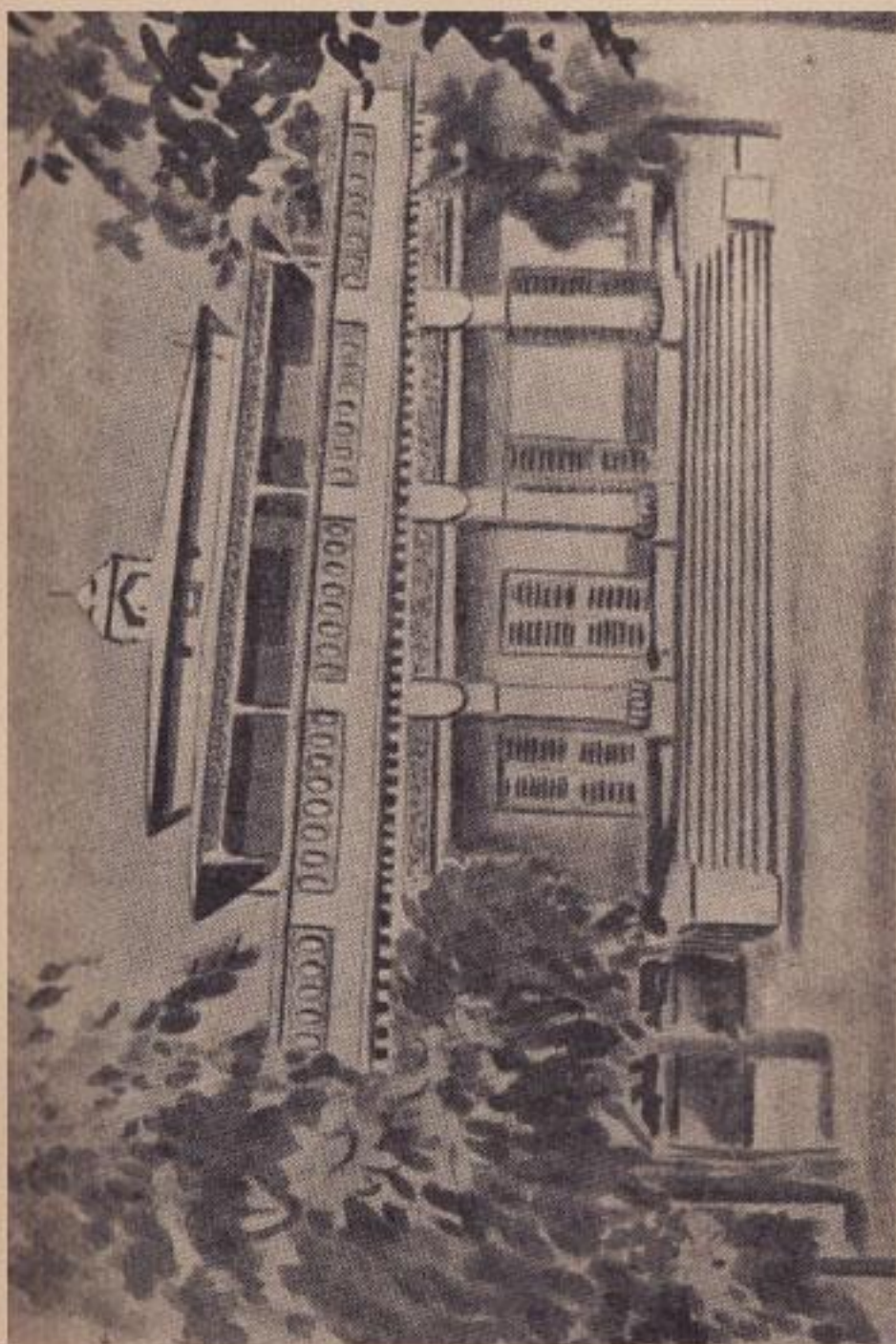
১৩২৭ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার। প্রত্যুষে উঠিয়া হাতমুখ প্রক্ষালনের পরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গেলাম। দেখিলাম বারান্দায় শয্যাপরি উপবিষ্ট হইয়া তিনি তামাকু সেবন করিতেছেন, আর আশেপাশে কয়েকজন ভক্ত কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত। তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিলেন আমার রাত্রিতে ঘুম হইয়াছে কিনা, আর সৎসঙ্গ উপলক্ষে তখনই তাঁহার সাথে বারাদি যাওয়ার কথা বলিলেন।

পরস্পরের মধ্যে তথায় যে কথাবার্ত্তা হইতে ছিল তাহা হইতে বুঝিতে পারিলাম খোকা ডাক্তারের বাড়ীতে "সৎসঙ্গ", নেওয়ার জন্য লোক আসিয়াছে, শ্রীশ্রীঠাকুর যাইতেছেন আর স্থানীয় সৎসঙ্গীগণও যাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও অন্যান্য সকলে ঘোড়ার গাড়ীতে রওনা হইলেন। আমিও তখন আমার থাকার স্থানে আসিয়া সহকর্ম্মী শ্যামচরণদা'কে সংবাদ দিয়া কুষ্টিয়া ষ্টেশন হইতে ট্রেনে রওনা হইলাম। জগতি ষ্টেশনে নামিয়া বারাদি গেলাম। কুষ্টিয়া টাউন হইতে বারাদি দুই তিন মাইল মাত্র ব্যবধান।

এই স্থলে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, গোপেন্দ্রনাথ সাহার ডাকনাম খোকা-ডাক্তার। ইনিও ডাক্তার। সৎসঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই আশ্রমের ডাঃ হরিপদদা'কে জানেন। খোকাডাক্তার হরিপদদা'র খুল্লতাত। বারাদির প্রসঙ্গের সাথে হরিপদদা'র ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকায় এইস্থলে তাহার সম্পর্কে কিছু বলিতে হইতেছে।

বর্ত্তমানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য-নৈমিত্তিক সেবাকার্য্যে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বিশেষতঃ এই কার্য্যোপলক্ষে যাহারা প্রতিক্ষণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটেই

করিতেছেন। তিনিও আমাকে প্রচুর বেদানা দিলেন। সেদিন আমার বেদানা খাওয়ার চূড়ান্ত হইয়া গেল। এই প্রকার ঘটনা যে কেবল আমারই হইয়াছে তাহা নয়, বহু সৎসঙ্গীর জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের এইরূপ মহিমার লীলাখেলার কথা শোনা যায়।

থাকেন, তাহাদের মধ্যে হরিপদদাও একজন এবং পূর্ব্বাগত। বাস্তবিক এই সাক্ষাতের দুই তিন বৎসর পরেই তিনি হিমাইতপুর আশ্রমে চলিয়া আসেন। তদবধি আশ্রমে থাকিয়া ইষ্টসেবাকার্য্যই করিতেছেন। তখন তিনি পূর্ণ যুবক—প্রচুর বিষয় সম্পত্তিরও মালিক, এই অবস্থায় ঐ সমস্ত লালসা এড়াইয়া ঐ বয়সে ইষ্টার্থে এই প্রকার আত্মদান বাস্তবিকই অটুট অনুরক্তির পরিচায়ক বটে। ডাঃ প্যারীদাও এই দৃষ্টান্তের অন্যতম।

ওখানেই পূজ্যপাদ গোঁসাইদা'র সহিত আমার প্রথম পরিচয়। আলাপ-আলোচনার মধ্যদিয়া ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম তাঁহার নাম সতীশচন্দ্র গোস্বামী, উপাধি—বিদ্যারত্ন, বাসস্থান—পাবনা টাউনের সংলগ্ন সালগাড়িয়া। ইনি প্রভুপাদ অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর। আরও শুনিতে পাইলাম হরিপদদা'র পূর্ব্ব-পূর্ব্বপুরুষ অদ্বৈতবংশেরই মন্ত্র-শিষ্য। সেই সূত্রে বর্ত্তমানে ঐ পরিবারের সকলেই গোঁসাইদা'র শিষ্য। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরই বর্ত্তমান পুরুষোত্তম গ্রহণ করার পর হইতে গোঁসাইদা'ও তাহাদিগকে পুনর্ব্বার এই "সৎ-মন্ত্রে" অভিষিক্ত করেন। তদবধি হরিপদদা'ও তাহাদের পরিবারস্থ সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরই ধ্যেয় ও জীবন্ত ইষ্টপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাভাবলীলায় মহাসংকীর্ত্তনের প্রধান পার্শ্বচর ৺অনন্ত মহারাজ, পূজনীয় গোঁসাইদা, ৺কিশোরী মোহন দাস, নাজিরপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় দুর্গানাথ সান্যাল প্রভৃতি। নবাগত ও অনাগত সৎসঙ্গীদিগের অবগতির জন্য ইঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় এই স্থলে দেওয়া যাইতেছে। হিমাইতপুরের সংলগ্ন কাশীপুর গ্রামে মহারাজের জন্মস্থান। নাম অনন্তনাথ

---

* বর্ত্তমান বয়সের হিসাবে দেখা যায় বাং ১২৮৪।৮৫ সালে পূজনীয় গোঁসাইদার জন্ম।

রায়। জন্ম ১২৭৩ সনের ৬ই আশ্বিন। পিতার নাম দ্বারকানাথ রায়। মাতার নাম ব্রহ্মময়ী দেবী। অনন্তনাথের জ্যেঠাসহোদরা বিনোদিনী দেবী। তাহার স্বামী রাধারমণ গোস্বামী। ইহার নিকট হইতেই মহারাজ সর্ব্বপ্রথম বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত হন। দীর্ঘকাল ঐ প্রণালীতে কঠোর সাধনা করিয়া কোন ফল না হওয়াতে নিতান্ত নিরাশ হইয়া অনন্তনাথ একদিন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন। সেই মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীঠাকুর হিমাইতপুর হইতে অকস্মাৎ ঘটনাস্থলে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে রক্ষা করেন। তদবধি অনন্তনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ মতে সাধনা করিতে থাকেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিবারভুক্ত হইয়া নূতন জীবনযাত্রা আরম্ভ করেন। বলিতে কি মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ঠাকুরপরিবারভুক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই একমাত্র উপাস্য-গুরুপুরুষোত্তম—এই ধ্যান আর এইভাব নিয়াই তিনি দিবারাত্রি মগ্ন ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রিত হওয়ার পর হইতেই অনন্তনাথের নাম 'মহারাজ'। ইনি পূর্ব্বে ডাক্তারি করিতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে গ্রহণ করার পরেও লোকসেবার্থে চিকিৎসাকার্য্য করিতেন। আশ্রমের প্রথম অবস্থায় দীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ভার মহারাজের উপর ছিল। ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন বাল্যসহচর। বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া বিগত ১৩৪১ সনের ২৯শে মাঘ মহারাজ আশ্রমে দেহরক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসংকীর্ত্তনের অপর প্রধান পারিষদ ছিলেন ভক্ত কিশোরীমোহন দাস। সৎসঙ্গীদের মধ্যে তিনি "কিশোরীদা" নামে পরিচিত। ইহার জন্মস্থান হিমাইতপুরের সংলগ্ন প্রতাপপুর—মাঝিপাড়া। কিশোরীদা পূজ্যপাদ গোঁসাইদা'র প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষাবধি কিশোরীদা গৃহীবৈরাগী সমাজভুক্ত। কিশোরীদাও ডাক্তার। পূর্ব্বে ঠাকুর হরনাথের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মহাভাবলীলা আরম্ভ হইতেই কিশোরীদা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ

করেন। কিশোরীদা'র বাড়ীতেই কীর্ত্তনের প্রধান স্থান ছিল। তাঁহার বাড়ীতেই কীর্ত্তনের সময় বহুবার শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবসমাধি হইয়াছিল। মহারাজ ও কিশোরী'দা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার লিখিত "জননী মনোমোহিনী ও শ্রীশ্রীঠাকুর" আর শ্রদ্ধেয় ব্রজগোপাল দত্তরায় এম এ, বি এল প্রণীত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র" নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। এই মহা-সংকীর্ত্তনের সাথীদিগের মধ্যে কোকন ও তরণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোকন জয়ঢাক বাজাইত, আর তরণী বাজাইত দামামা। কীর্ত্তনের সময় কিশোরী দা, কোকন ও তরণীর ভাবোন্মাদনা যাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহারাই বিস্মিত হইয়াছেন। কোকন ও তরণী উভয়েই অনুন্নত শ্রেণীর লোক। উভয়েই পাবনা কোর্টের আরদালী ছিল। আফিসের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিয়মিতভাবে কীর্ত্তনে যোগদান করিত—এত তীব্র ছিল ইহাদের ইষ্টানুরক্তি! অনুন্নত শ্রেণীর হইয়াও শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শ পাইয়া অকৃত্রিম ইষ্টানুগ চলনে তাহারা যে বিশেষ উন্নত হইয়াছিল, তাহাদের আচরণ হইতেই বুঝা যাইত। শ্রীরামচন্দ্রের সংস্পর্শে ধন্য ভক্তগুহকের জীবন্তরূপ যেন তাহাদের মধ্যে প্রকটমান ছিল।

বিগত ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময় দেখিয়াছি, কিশোরী'দা শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ কাঁটায় কাঁটায় পালন করিয়াছেন। তাহার প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশ ছিল—সমাগত দুস্থগণের চাউল বিতরণ শেষ হইলে পরে তাহার অন্ন-গ্রহণ। এই জন্য ঐ সময় প্রায়শঃ সারাদিন অভুক্ত থাকিয়া সন্ধ্যার পরে তাহাকে আহার গ্রহণ করিতে হইত। কিশোরীদা'র অমায়িক ব্যবহার ও আপ্রাণ সেবাগুণে আশ্রমবাসী সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। বিগত ১৩৫১ সনের বৈশাখ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৬০ এর উর্দ্ধে হইয়াছিল।

পূর্ব্বে যাহা বলিতে ছিলাম—বারাদি সৎসঙ্গ উপলক্ষে **প্রফুল্লচন্দ্র রায়**

উকিল, ডাঃ গোকুলচন্দ্র মণ্ডল এল এম এস, পূর্ণচন্দ্র কবিরাজ বি এ, ডাঃ সত্যচরণ দত্ত প্রভৃতি কুষ্টিয়ার পুরাতন সৎসঙ্গীভ্রাতাদিগের সহিত পরিচয় হইল। "সৎসঙ্গ" কী, বিনতি প্রার্থনাই বা কী, এই বিষয়ে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা ওখানেই। সারাদিন বারাদি থাকিয়া সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া ফিরিলাম।

পরদিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিতে অশ্বিনীদার বাড়ীতে গেলাম। ডাঃ জোয়ারদার আমার দীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন"—তা' হ'য়ে গেছে ; এখন অশ্বিনীদার সাথে পরিচয় ক'রে দিলেই হবে।" তখনই ডাঃ জোয়ারদার আমাকে নিয়া অশ্বিনীদার নিকট গেলেন আর পরিচয় করাইয়া দিলেন। জানিতে পারিলাম—রাত্রিতে তিনি এই বাসায় আসিয়াছেন। অশ্বিনীদার প্রথম আলাপন কোথা হইতে কি কারণে আমার কুষ্টিয়ায় আসা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কোন্ সূত্রে পরিচয় ইত্যাদি। তারপরেই "নাম", ধ্যান ও জীবন্ত সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কথাপৃষ্ঠে আমিও প্রকাশ করিলাম—যোগশাস্ত্র অনুসারে ভ্রূ-মধ্যে ওঁকার জপ ক'রেছিলাম, বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায়নি। এখন বুঝতে পে'রেছি—সদ্‌গুরুর সাহায্য ব্যতীত অনুমানে যে অভ্যাস করা হয় তা'তে ভুল থাকে, আর জীবন্ত গুরুর ধ্যানই যে সমীচীন তদ্বিষয়েও কোন প্রশ্ন নেই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে "ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিম্" এই বাক্য আছে। স্থূল ও সূক্ষ্ম হিসাবে বীজের শক্তিরও যে তারতম্য আছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ গায়ত্রী দীক্ষার পরে শক্তি বা কৃষ্ণের বীজ গ্রহণান্তর উপাসনাপদ্ধতি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রথম ক্ষর, তৎপরে অক্ষরপুরুষ, সর্ব্বোপরি পুরুষোত্তমের উপাসনা; আর মহানির্ব্বান-তন্ত্রের প্রথমে ব্রহ্ম, পরে পরব্রহ্ম, সর্ব্বশেষ পরমপুরুষের উপাসনাই শ্রেয় এবং শ্রেষ্ঠ—একই অর্থ সূচিত করে। "সৎনাম" যে সর্ব্বোচ্চ ও সমস্ত বীজের আদি সে সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন নেই। অধিকন্তু এই প্রণালীতে সাধনা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সম্পূর্ণ নিরাপদ সে বিষয়েও আমার কোন দ্বিধা নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর কত মহান্! তাঁহার দিব্য স্পর্শ হ'তেই স্পষ্ট অনুভব হ'তেছে। আলোচনা শেষ

হইলে পরে আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসিলাম। অশ্বিনীদার সাথে যে যে কথা হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। তৎপরে বাড়ী রওনা হওয়ার কথা তুলিতেই আরও কয়েকদিন থাকার জন্য তিনি বলিলেন। সেই নির্দ্দেশ মতে আমিও রহিয়া গেলাম। ইহার তৃতীয় কি চতুর্থ দিন শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়া হইতে হিমাইতপুর চলিলেন। ষ্টিমারঘাটে বহু ভক্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। আমিও গিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলাম। ষ্টিমারে উঠিবার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের সহিত আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া যতশীঘ্র সম্ভব হিমাইতপুর আশ্রমে যাওয়ার কথা বলিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ষ্টিমারে আরোহণের পর সাশ্রুনয়নে মুগ্ধ। আমি নির্ব্বাক তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম এবং ষ্টিমার অদৃশ্য হওয়ার পরে রেলষ্টেশনে চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই কলিকাতা হইতে মেইল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ও গ্রামদা গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। পরদিন পূর্ব্বাহ্ন দশটার মধ্যেই বাড়ী পৌছিলাম। তারপাসা ষ্টিমার ঘাট হইতে তখন আমাদের বাড়ী মাত্র দেড়মাইল ব্যবধান। যে সময়ের কথা বলিতেছি— তৎকালে আমাদের বাড়ী বিক্রমপুরের অন্তর্গত লৌহজঙ্গ থানার অধীন পাইকারা গ্রামে। বিগত ১৩৩৯ সনের ভাদ্রমাসে ঐ বাড়ী পদ্মা গর্ভে বিলীন হয়। উহাই ছিল পৈতৃক ভদ্রাসন বসতবাড়ী—আমার জন্মভূমি। তৎপরে দুই তিন বৎসর পাতনা অবস্থায় থাকিয়া ঢাকা সহরের সংলগ্ন কমলাপুর নামক স্থানে বাটী নির্ম্মাণ হইলে ১৩৪২ সনের আষাঢ় মাসে আমার পরিবারস্থ সকলে ঐ বাড়ীতে গিয়া বসবাস করিতে থাকি। পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার পরে বিগত ১৩৫৫ সনের মাঘ মাসে পুনরায় ঐ বাটী পরিত্যাগ করিয়া সকলে কলিকাতা চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।

পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম - কুষ্টিয়া হইতে বাড়ী ফিরিলাম বটে, কিন্তু গোটা নূতন মানুষ হইয়া, যেন নূতন জন্ম নিয়া। মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্তি— ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট দীক্ষা প্রাপ্তি মাত্র দেহী ব্রহ্মময় হয়—আর সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার জন্মে ; ঋষিবাক্যের এই সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিলাম। এই উক্তির

মধ্যে অতিরঞ্জন কিঞ্চিন্মাত্রও নাই। প্রণামান্তে মাতৃদেবীকে আগেই জানাইয়া রাখিলাম তাঁহার ওখানে নিরামিষ খাইব, একজন বিচক্ষণ ডাক্তার আমিষ আহার সম্পর্কে নিষেধ করিয়াছেন। মা কোনই আপত্তি করিলেন না। খাওয়ার সময়ে গৃহিণী বলিলেন—তুমি যেন আগের মানুষ নেই, বদল হয়ে এসেছো। আমিও হাসিয়া স্বীকারোক্তি করিলাম—যা' বল তা' ঠিকই!

আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছেনা; তীব্র অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিলাম। আর জানালার ফাঁক দিয়া মাঝে মাঝে চাহিয়া দেখিতেছি রৌদ্রের তেজ হ্রাস পাইয়াছে কিনা; অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া বৃক্ষতলে বসিলাম। তথা হইতে মাঠের দিকে লক্ষ্য রাখিলাম—শরৎদা মাঠে আসিয়াছেন কি না। যাহার কথা বলা হইতেছে, ইনি আমার আবাল্যবন্ধু শরৎবিহারী নন্দী। দেওঘর সৎসঙ্গ-হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ গোকুলবিহারী নন্দীকে সৎসঙ্গীদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন। তাহারই পিতা শরৎবিহারী নন্দী। হৃদ্যতা থাকার দরুণ শরৎদা ও আমি অবকাশমতে প্রায়ই মিলিত হইতাম। সদ্গ্রন্থাদি পাঠ ও সদ্গুরু সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করাই ছিল আমাদের ঐরূপ মিলিত হইবার প্রধান উপভোগ্য বিষয়বস্তু। আমাদের মধ্যে এই চুক্তিও ছিল—একজন সদ্গুরুর অনুসন্ধান পাইলে অপরকে জানান হইবে। তাই আজ নন্দীদার জন্য এত আগ্রহ। কিছুক্ষণ পরেই নন্দীদা মাঠের দিকে আসিলেন। আমিও গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলাম। আদ্যোপান্ত ঘটনা তাহাকে বলিতে লাগিলাম, তিনিও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে থাকিলেন। সর্বশেষে এই স্থির হইল—মোকাম হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ৺লক্ষ্মীপূজার পরে আমার সাথে আশ্রমে যাইবেন। এই প্রতিশ্রুতি নন্দীদা রক্ষা করিয়াছিলেন। নির্দ্ধারিত সময়ে আমার সাথে তিনি হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়াছিলেন এবং "সৎনাম" গ্রহণও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘটনাতে নন্দীমা (তাঁহার স্ত্রী) আমার উপর খাপ্পা হইয়া রহিলেন। তাহার এই ধারণা হইল—আমারই প্ররোচনায়

নন্দীদা পূর্ব্ব মন্ত্র ও গুরুত্যাগ করিয়া এই নূতন পথে চলিয়াছেন। নন্দীদা বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার এই ভ্রান্তি অপনোদন করিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় কয়েক মাস অতীত হইয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে নন্দীমা অকস্মাৎ প্রবল জ্বরাক্রান্ত হইয়া রাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখেন এবং পরদিনই তাহার বাড়ীতে আমাকে নেওয়াইয়া "নাম" গ্রহণ করেন। এখন নন্দীমা একজন পরমা ভক্তা, অধিকাংশ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যেই থাকেন।

প্রথমযাত্রা আশ্রমে গিয়া নন্দীদা কয়েকদিন ছিলেন। ভক্ত কিশোরীদার বাড়ীতে নিত্য-সংকীর্ত্তনের জন্য এই সময়ে একখানা স্থায়ী ঘর নির্ম্মিত হইতেছিল। ঘরের চালা মাত্র হইয়াছিল কিন্তু বেড়া, চৌকাট, কপাট ও জানালা সমস্তই বাকী ছিল। অর্থের অনটনে কাজ শেষ হইতে পারে নাই। এই বিষয় জানাইবার জন্য ঐ সময়ে কিশোরীদা একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর উপস্থিত কয়েকজনকে লক্ষ্য করিয়া এই মত প্রকাশ করিলেন—প্রত্যেকেই এক এক জিনিষ করিয়া দেওয়ার ভার নিলেই গৃহকার্য্য অনায়াসে সত্বর নিষ্পন্ন হইতে পারে। তদনুসারে শরৎদা বেড়া করিয়া দিবার ভার নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই বাবদ আমাকে কিছু দিবার জন্য না বলাতে শরৎদা উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তিনি কেন বাদ যাইবেন। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর এই বলিলেন—ত্রৈলোক্যদা? এ সব কিছু না, ইনি দেবেন "মাল"! এই ইঙ্গিত হইতে আমি বুঝিতে পারিলাম—"নাম" দেওয়া আর লোক সংগ্রহ করা—এই দুইটিই আমার প্রধান করণীয়।

নন্দীদার সহিত আলোচনা করিয়া আমার বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। রাত্রিতে মা, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠাভগ্নী ও স্ত্রী সকলকে একত্র করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলাম। ভাগ্যক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কি রকমে কুষ্টিয়ায় আকস্মিক যোগাযোগ সংঘটিত হইল, তাঁহার দিব্য স্পর্শ পাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অভূতপূর্ব্ব কি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, এই সমস্ত বিষয় নিয়া কথোপকথনে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। অনন্তর শয়ন করিতে গেলাম।

এই সময়ে স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিলাম - এই সেই "নাম" যাহা মৃত্যুমুখে সপ্নাবস্থায় পাইয়াছিলাম। শুনিয়াই সে চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। আর আনন্দে তাহার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইল।

এইস্থলে উল্লিখিত স্বপ্ন-বৃত্তান্ত না বলিলে মূল ঘটনা যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া যায়। তাই পাঠকগণের অবগতির জন্য সংক্ষেপে সেই বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের অব্যবহিত পরেই সমগ্র ভারতব্যাপী এক মহামারী দেখা দিয়াছিল; সর্বসাধারণ উহা সমরজ্বর (War-Fever) বলিত, আর ডাক্তারগণ আখ্যা দিয়াছিলেন Infecting Influenza। এই নিদারুণ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া তৎকালে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুকবলে পতিত হইয়াছিল। আমিও ১৩২৫ সনের আশ্বিন মাসের শেষভাগে এই নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। রোগে আক্রান্ত হওয়ার কয়েকদিন পরেই অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রি বারটার পর হইতে তীব্র পিপাসা, উদর বায়ুতে পরিপূর্ণ, জিহ্বা আড়ষ্ট, গাত্র হইতে অবিশ্রান্ত স্বেদ নির্গম ইত্যাদি দুর্লক্ষণ দেখা দিল। প্রভূত পরিমাণ পানীয় পানেও কিছুতেই পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছেনা; শরীর ক্রমেই অবসন্ন— বুঝিতেপারিলামমৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় চেষ্টা সত্ত্বেও ভগবানের নাম স্মরণে আসিতেছে না। তা' যে কি বিভ্রম! কি বিষম বিভ্রাট! বলিতে পারিনা। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ভগবৎ উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পন করিলাম। পরক্ষণেই তন্দ্রায়িত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিলাম—এক দিব্যপুরুষ অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া উপবেশন পূর্বক আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া অভূত-পূর্ব অভিনব এক "নাম" কর্ণমধ্যে প্রদান করিয়া তখনই অন্তর্ধান হইলেন। তদবস্থায় আপনা হইতেই অন্তর্জপ চলিতে থাকিল এবং তৎক্রিয়া প্রভাবে অনতিকালমধ্যে আশ্চর্য্যবৎ রোগের উৎকট অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নিদ্রাভঙ্গে নিজেকে অনেক সুস্থ বোধ করিলাম, কিন্তু নামের স্মৃতি অবচেতন অবস্থায় চলিয়া গেল। আমার স্ত্রী নিকটেই ছিল, তাহাকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত

বলিলাম। তাহার নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে মা, খুড়ামহাশয়, জ্যেঠাভগ্নী এই বৃত্তান্ত জানিলেন। উহা এক দৈবঘটনা বলিয়া তাঁহারা মনে করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শ হইতে ঐ স্বপ্নপ্রাপ্ত "নাম" পুনশ্চেতনাবস্থায় আসিল। *

স্বপ্নে এই প্রকার নাম প্রাপ্তির পূর্বে একজনে আমাকে শক্তিমন্ত্র দিয়াছিলেন। আমার স্ত্রীও তখন ঐ মন্ত্র নিয়াছিল। আমার পিতামাতা যাঁহার নিকট হইতে মন্ত্র নিয়াছিলেন, সেই বংশেরই এক প্রাচীন ব্যক্তি এই মন্ত্রের উপদেষ্টা। অত্যল্প কাল মধ্যে মন্ত্রের চেতনা হইবে এই ভরসা পাইয়া তাঁহারই একান্ত আগ্রহে তখন এই মন্ত্র লওয়া হয়। তৎকালে আমার বয়স বিংশতির অনধিক। কিন্তু বলা বাহুল্য, তদুপদিষ্ট প্রণালীতে অনেক দিন জপ করা সত্বেও বিশেষ কোন ফল হইয়া ছিলনা। *

---

* এই ঘটনা ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত "জননী মনোমোহিনী ও শ্রীশ্রীঠাকুর" এই পুস্তকের ২২৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

* স্বপ্নের সত্যতা সম্পর্কে নানা জনার নানা মত, কেহ বিশ্বাস করেন, আর কেহ বিশ্বাস করেন না। সকল স্বপ্নই যে সত্য ইহাও বলা যাইতে পারে না, আর সবগুলি উড়াইয়া দেওয়াও ঠিক নয়। আমার জীবনে তিনটী স্বপ্ন সফল হইয়াছে প্রত্যক্ষভাবে। একটীর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। অপরটী আমার পাঠ্যজীবনে। আর একটি শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যোগাযোগ হইবার পরে।

পাঠ্যজীবনের স্বপ্ন বৃত্তান্ত—তখন আমি এণ্ট্রান্সের তৃতীয় শ্রেণীর (ম্যাট্রিকুলেশনের অষ্টম মান) ছাত্র। তখন রাশিয়ার সহিত জাপানের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। রাশিয়ার বিরাট নৌ-বহর প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া জাপানের উপকূলে আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ নৌ-বহর ব্লাডিভষ্টক হইতে পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত টহল দেয়। রাশিয়ার নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি ম্যাকেয়ার আর জাপানের নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি টোগো। ঐ

পূর্ব্বে যাহা বলিতে ছিলাম—ঐ রোগ হইতে আরোগ্য লাভের তিন চারি মাস পরে সেই উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দৃষ্টস্বপ্ন বিষয়ে যাবতীয় ঘটনা জানাইয়াছিলাম। রোগের বিকার অবস্থায় মাথার বিকৃতি হইতে ঐরূপ দর্শন ইত্যাদি কথা বলিয়া তিনি উহা উড়াইয়া দিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে বরং বিপরীত ফল হইল। তখন আমি ঐ পন্থা ছাড়িয়া দিয়া সকালে সন্ধ্যায় ভ্রূ-মধ্যে ওঁকার মানস-জপ আরম্ভ করিলাম, আর প্রাতে গীতার—"ত্বমাদিদেব পুরুষ পুরাণঃ" পুরুষোত্তমের প্রতি অর্জ্জুনের স্তুতি নিত্য প্রার্থনীয় করিয়া নিলাম। এই স্থলে আর একটিকথা প্রকাশ না করিয়া পারিলাম না—স্বপ্নে নাম প্রাপ্তির পর হইতে

সময়ে ক্লাসে আসিয়াই প্রত্যেক শিক্ষক যুদ্ধের বিষয় নিয়া গল্প তুলিতেন। আমরাও উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতাম। যুদ্ধ বাঁধিবার কয়েক মাস পরে একদিন রাত্রিতে আমি স্বপ্ন দেখিলাম—যেন প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া পোর্ট আর্থার চলিয়া আসিয়াছি। ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি; প্রবল বাত্যাসহ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইতেছে। দেখিতেছি—রাশিয়ার নৌ-বহর একবার পোর্ট আর্থারের দিকে আসিতেছে, আবার জাপানের নৌ-বহর টহল দিয়া তাড়া করিতেছে। মাঝে মাঝে বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিতেছে, আবার কিছুক্ষণ পরেই নির্বাপিত হইয়া যায়। মাঝে মাঝে জাহাজের তীব্র সার্চ-লাইটও দেখা যাইতেছে, আলোগুলি এই আছে। এই নাই, সে এক বিস্ময়কর অভিনয় চলিয়াছে। অকস্মাৎ সমস্ত আলোগুলি নির্বাপিত হইয়া গেল। জাপানের রণতরীগুলি যেন ভয়ে ভয়ে ভিতরে চলিয়া আসিল। এই অবসরে রাশিয়ার নৌ-বহর পোর্ট আর্থারে প্রবেশ চেষ্টা করিতেই চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ শব্দে সমুদ্রের জল তোলপার করিয়া অনবরত মাইন ফাটিতে থাকিল। দেখিলাম—আচম্বিতে মুহূর্ত্তের মধ্যে রাশিয়ার রণতরীগুলি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া ডুবিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে

ইহাও স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম—যেন এক অলৌকিক শক্তি অদৃশ্যে থাকিয়া আমার ভিতরে সর্ব্বদা প্রেরণা দিতেছে। তদবধি আমার কর্ম্মশক্তি অদম্য হইয়া উঠিল। ঐ সময়েই ঐ অবস্থায় অন্তর আবেগের অনুপ্রাণনা হইতে কতকগুলি ভাবসঙ্গীত আমার মনে স্বতঃ জাগ্রতঃ হইয়া উঠিতে থাকে; তাহা যেন গীতার ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া। এক সময়ে কাজে লাগিবে মনে করিয়াই ঐ সমস্ত সঙ্গীত তখন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। এই সমস্ত সঙ্গীত পরে পুস্তকাকারে ছাপান হইয়াছিল। কি নামে, কোন্ সূত্রে, কোন্ সময়ে ছাপান হইয়াছিল, সেই বিবরণ পশ্চাতে আছে।

ম্যাকেয়ারও সলীল সমাধি পাইল। ইহার পরেই স্বপ্নভঙ্গ। এই ঘটনার পরদিন ইংরাজীর শিক্ষক কুঞ্জবাবু (কুঞ্জবিহারী ঘোষ) ক্লাসে আসিয়া যুদ্ধের কথা তুলিতেই আমি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিলাম। তাহাতে তিনি হাসিয়া এই উক্তি করিলেন—জাপান জয়ী হউক, এই তোমাদের ইচ্ছা, তাই ঐ প্রকার স্বপ্নের আবির্ভাব। অঙ্কের শিক্ষক কুলদাবাবু (কুলদাকান্ত দত্ত) যুদ্ধের আলাপন করিতেই তাঁহারও নিকট স্বপ্নের কথা বলিলাম। তিনিও শুনিয়া ঐ একই মত প্রকাশ করিলেন। এই সুযোগ নিয়া সহপাঠীদের মধ্যে দু-একজন বিদ্রূপও করিল। লজ্জিত হইয়া আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার দুইদিন পরেই দৈনিক হিতবাদী পত্রিকায় সংবাদ উঠিল—ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখেই রাত্রিতে জাপানের সহিত নৌ-যুদ্ধে রাশিয়ার বিরাট নৌ-বহর ডুবিয়া গিয়াছে, আর ম্যাকেয়ারও সলীল সমাধি পাইয়াছে। এই রূশো-জাপ যুদ্ধের সময়েই কলিকাতা হইতে প্রথমদৈনিক খবরের কাগজ বাহির হয়। ইহার পূর্ব্বে কোন দৈনিক কাগজ ছিল বলিয়া শোনা যায় নাই। আর তৎসময়ে বর্ত্তমানকালের ন্যায় গ্রামে গ্রামে কাগজ বিক্রেতা কোন হকারও ছিল না। পোষ্ট-অফিস দিয়া সমস্ত কাগজ তখন মফঃস্বলে আসিত। তাই মফঃস্বলের লোকেরা

কুষ্টিয়া হইতে বাড়ী আসিবার পরে অন্য এক অবস্থার সৃষ্টি হইল —কেবল শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধীয় আলোচনাই ভাল লাগে, আর কিছুতেই মন বসিতে চায় না, যাহাকে পাই তাঁহাকে ধরিয়াই এই কথা—এই প্রসঙ্গের অবতারণা করি। আর এক অন্তর-আকর্ষণ প্রতিক্ষণ যে লাগিয়াই আছে— তাহাও বোধ করিতে থাকিলাম। চেষ্টা করিয়াও বিষয়ান্তরে মন নিতে পারি না। এই প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়া বাড়ীতে কোন প্রকারে তিন চারি দিন কাটিয়া গেল, অবশেষে অতিষ্ঠ হইয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গঙ্গানগর গ্রামে আমার মাসীমার বাড়ী চলিয়া আসিলাম। তিনি নিঃসন্তান। অতএব আমার প্রতি তাহার যথেষ্ট টান ছিল, বহুদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে পাইয়া মাসিমা অতিশয় উৎফুল্ল

দুই তিনদিন পরে কাগজ পাইত। আমাকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্য হইতেই মাষ্টার কুঞ্জবাবু ও কুলদাবাবু উভয়েই ক্লাসে পড়াইতে আসিয়া এই সংবাদ জানাইয়া ছিলেন।

তৃতীয়টি স্বপ্নও বলিতে পারি কিম্বা দর্শনও বলা যাইতে পারে। ইহাও ন্যূনপক্ষে তেত্রিশ-চৌত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। কুমিল্লা-টাউনে তখন আমার যাজন তীব্র বেগে চলিয়াছে। প্রত্যেক দিনই কোন-না কোন প্রতিষ্ঠানে আমার বক্তৃতা বা আলোচনা হইত। সেই দিন কোন বিপুল জনতার সমক্ষে বক্তৃতা করার পরে বাসায় আসিয়া শয়ন করিয়াছি। "নাম" অনবরত চলিয়াছে, কিন্তু আমি জাগ্রত কি তন্দ্রাস্বিত তাহা ঠিক বলিতে পারিতেছি না। এই অবস্থায় দর্শন হইতেছে—কোথাও বিপুল জনতার নিকট বক্তৃতান্তে প্রশস্ত রাজপথ দিয়া বরাবর পশ্চিম অভিমুখে ফিরিয়া আসিতেছি। এই অবস্থায় দুই জন বিশালকায় নাগা সন্ন্যাসী আমার পেছন ধরিল। হাতে তাহাদের প্রকাণ্ড ত্রিশূল। হাবভাবে মনে হইতেছে তাহারা যেন আক্রমণ উদ্দেশ্যেই আমার পশ্চাতে ধাবমান। তখন

হইয়া উঠিলেন। জ্যৈষ্ঠমাস। বাড়ীতে গাছে গাছে আম কাঁঠালে পরিপূর্ণ। দুধ, ক্ষীর, পায়েস ইত্যাদি রাজভোগ নিত্য চলিতে থাকিল। কিসে আমি খুশী হইব এই নিয়াই মাসীমা সর্ব্বদা ব্যস্ত। যাহাতে দীর্ঘদিন ওখানে থাকি—ইহাও তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। আমার কিন্তু ওসব কিছুতেই ভাল লাগিতেছে না, সেই অন্তর-আকর্ষণ লাগিয়াই আছে। সপ্তাহকাল

আমি দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিলাম। তাহারাও তদ্ধবেগে ধাওয়া করিল। শেষ পর্য্যন্ত দিশা না পাইয়া পথিপার্শ্বে এক কামারশালায় আমি ঢুকিয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসীদ্বয় কিছু দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিল। কর্ম্মকার উত্তপ্ত লৌহ নেহাই-এর উপরে রাখিয়া হাতুরী দ্বারা আঘাত করিতেছিল কিন্তু আমার প্রতি তাহারা যে কোন লক্ষ্য ছিল মনে হয় না। তথায় কিছুক্ষণ থাকার পরেই সুযোগ বুঝিয়া বাহির হইয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিলাম। সন্ন্যাসীদ্বয়ও তদ্বৎ দ্রুত পশ্চাতে ধাবমান হইল। "নাম" করার বেগের সহিত তখন আমারও চলার বেগ বাড়িয়া গেল। সন্ন্যাসীদ্বয় কিছুতেই আমার নাগাল পাইতেছে না। অনন্তর তাহারাও বেগ এত বাড়াইল যেন আমায় ধরে ধরে—এমন সময়ে সম্মুখে প্রশস্ত ফটকবিশিষ্ট এক বিরাট প্রাসাদ অতি সন্নিকটে পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। তথায় দেখিতে পাইলাম—সহস্র সহস্র লোক মিলিত কণ্ঠে গাহিতেছে —রাধাস্বামী নাম যো গাওয়ে সোই তরে।" পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম ইত্যবসরে আক্রমণকারী সন্ন্যাসীদ্বয় অদৃশ্য। তন্মুহূর্ত্তে আমারও ঐ প্রকার দর্শনের পরিসমাপ্তি। এই দর্শনের বৎসরকাল পরেই হিমাইতপুর আশ্রমে বিশ্ববিজ্ঞানের বিশালকায় দ্বিতল বাটিকা নির্ম্মিত হয়। এই স্থানেই প্রথম ঋত্বিক সম্মিলনী। আর তদুপলক্ষে সেইদিন তথায় সহস্র সহস্র লোকের মিলিত কণ্ঠে "রাধাস্বামী নাম যো গাওরে" ধ্বনীত হইয়াছিল।

পাঠকগণের পরিস্কার ধারণার জন্য স্বপ্ন সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিমত

তথায় অতিবাহিত করিয়া মাসীমার একান্ত আগ্রহ ছেদন করিয়া আমি বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতেও থাকিতে পারিল না, তিন-চার দিন পরেই আশ্রমে রওনা হইলাম। স্ব-গ্রামবাসী সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি-এ—হেড-মাষ্টার সাথী হইলেন। কুষ্টিয়া-ঘাট-ষ্টেশন হইতে শেষ রাত্রিতে ষ্টিমারে চাপিয়া প্রাতে বাজিতপুর ঘাটে নামিলাম। তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে মাত্র। আশ্রমের পথে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইলাম—শ্রীশ্রীঠাকুর নদীর তীরে বাবলা তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই উৎসাহের সহিত "ত্রৈলোক্যদা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং প্রণাম করিবার পূর্বেই জড়াইয়া ধরিলেন। কেমন আছি, কোথা হতে এসেছি, পথে কষ্ট হয় নাই ত ইত্যাদি কত কথা মুহূর্ত্ত মধ্যে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিলেন। তদন্তর আমাদিগকে নিয়া নিকটস্থ একখানা দ্বিচাল টিনের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ইহাই সেই চিরপরিচিত গাবতলার ঘর।

এইস্থলে উদ্ধৃত করা হইল। সন—১৩৪৮—২৬শে অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ইং ১১-১২-১৯৪১ সাল। নানা প্রশ্নের উদ্ভব ও উত্তর হইতেছে। ইহার মধ্যে স্বপ্ন বিষয়ে প্রসঙ্গ হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন "মস্তিষ্কে যে ইচ্ছা, চিন্তা কল্পনা ও স্মৃতির ছাপ থাকে, তাই স্বপ্ন আকারে দেখা দেয়। আমাদের অপূর্ণ বহু ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তৃপ্তির সন্ধান খোঁজে। জোড়াতালি দিয়ে চিন্তা মাফিক নানা-ভাবে হাজির হয়। এই জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নেই, এমন কত জিনিষও স্বপ্নের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের মাথাটা হলো চিত্রগুপ্তের খাতা। অনন্ত জীবনের কথা লিখা আছে ওর পাতায় পাতায়। নামধ্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের কোষগুলি যদি উপযুক্ত ভাবে জাগ্রত করে তোলা যায় পূর্ব পূর্ব জীবনের অনেক কিছু স্মৃতি স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় ধরা দিতে পারে। আমাদের মন যখন যে ভাবে থাকে সাধারণতঃ তখন তৎজাতীয় স্বপ্ন দেখা যায়; স্বপ্ন যে কেবল

এই গৃহেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার কীর্ত্তনের সহচরদিগকে লইয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন। কিছুক্ষণ পরেই জননীদেবী তথায় আসিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। ক্রমে ক্রমে অনন্তমহারাজ, সুশীলদা, নফরদা, কিশোরীদা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল। এই গৃহ হইতে অনতিব্যবধানে পশ্চিম দিকে অপর একখানা চৌচালা ছোট টিনের ঘর ছিল, ওখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হইল। তখন বিছানা, সুট্‌কেস সহ সেই গৃহের দিকে চলিলাম। গাবতলার ঘর হইতে ঐ গৃহ বিশ গজের অনধিক। এইটুকুস্থান যাইতে ভাইট-মটকিলা ইত্যাদি আগাছা পরিপূর্ণ এক ক্ষুদ্র জঙ্গল অতিক্রম করিতে হইল। পরবর্ত্তীকালে ঐ ভিটিতে শ্রীশ্রীমায়ের কটেজ নির্মিত হইয়াছিল। ঐ স্থান হইতে ন্যূনাধিক একশত গজ ব্যবধানে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্দর বাড়ী। আর ওখান হইতে অন্দরবাড়ী প্রবেশ করিতে অসংখ্য গাছ-আগাছা সন্নিবিষ্ট বনঅরণ্য পার হইয়া যাইতে হইল। ঐসমস্ত গাছের মধ্যে বাবলাই সংখ্যা

অতীতের দেখা যায় তাহা নয়, ভবিষ্যতকেও জানা যায়, কোন আত্মা এসে ভবিষ্যত সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে গেল। একই স্বপ্ন Simultaneously (যুগপৎ) কয়েকজন দেখ্‌ছে এমনতরও দেখা যায়। এ সব tuning (একতানতার) ব্যাপার। যা আমরা চোখে দেখিনা, কাণে শুনি না, ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধ করি না, তা' যে নেই, তা' নয়।

আমাদের ইন্দ্রিয় গুলির শক্তি সীমাবদ্ধ, তাই তার উপরে যা' তা' আমাদের কাছে—না থাকা হয়ে আছে। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গুলির ও মস্তিষ্কের শক্তি অনুশীলনের সাহায্যে অফুরন্তভাবে বাড়ান যায়, তখন আমাদের অনুভবের রাজ্যও অতখানি বিস্তার লাভ করে। তখন একটা মানুষের বাহ্য-প্রস্রাব দেখেই হয় তো তাহার চরিত্র ও চেহারা পর্য্যন্ত বলে দিতে পারবে।"

পরিষ্ঠ। দিনের বেলাতেই শিয়াল, সজারু, বরাহ, বাঘডাঁশা প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ তথায় স্বেচ্ছায় বিচরণ করিত; মাঝে মাঝে রাত্রিতে ব্যাঘ্রের গর্জ্জনও শোনা যাইত। এই বর্ণনা পাঠ করিয়া পশ্চাদাগত সৎসঙ্গী দাদা ও মায়েরা হয়তো অনেকেই বিস্মিত হইবেন কিম্বা বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তৎকালে আশ্রম বলিতে পদ্মাতটে অবস্থিত পূর্ববর্ণিত ঐ দুইখানা টিনের ঘর, আর শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্দর বাটীস্থিত কতিপয় ঘর নিয়াই ধরা হইত। তখন পর্যান্ত তপোবন বিদ্যালয়, বিশ্ববিজ্ঞানের সুবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা, কেমিক্যাল ওয়ার্কস, পাওয়ার হাউস, সভাসমিতি ও নাটের সুবিস্তীর্ণ প্যাণ্ডেল, সৎসঙ্গ-মাতৃমন্দির, গেষ্ট-হাউস, ঋত্বিক আফিসের সুবৃহৎ বিল্ডিং, পোষ্ট-অফিসের দীর্ঘায়তন গৃহ, বাবা ও মায়ের কটেজ, নিভৃত—অস্তিকায়ন, ইলেকট্রীক লাইট, রোগীচর্য্যালয়, টিউব-ওয়েল, মোটোর-বাস-ট্যাক্সি ইত্যাদি চলাচলের সুপ্রশস্ত রুট, পাড়ায় পাড়য় যাতায়াতের সুবিন্যস্ত পথঘাট কিছুই ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্দর বাড়ীর সীমানা হইতে তপোবনের জমি পর্য্যন্ত যাইতে অসংখ্য বাঁশঝাড় ও জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়রান হইতে হইত। আর সমগ্র গ্রামের অবস্থা যে কি ছিল, তাহা পূর্ব্বকৃত বর্ণনা হইতেই সহজে অনুমেয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে জঙ্গলাকীর্ণ হিমাইতপুর সুন্দর সুবিন্যস্ত পথঘাটসমন্বিত অট্টালিকাপরিপূর্ণ মনোমুগ্ধকর ইন্দ্রপুরীতে পরিণত হইয়াছিল। আর পানাসক্ত, পথ্যাচারী, পরস্বাপহারী, পরদারলিপ্ত দুশ্চরিত্র নীচ-প্রকৃতি-জনগণ-সমাকীর্ণ-স্থান ইষ্টানুরাগী, সাধু, সচ্চরিত্র, সমদর্শী, বিশুদ্ধ ভাবরাজিপরিপূর্ণ সদাচারী ব্যক্তিগণের লীলাভিনয়-ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহা বলিতেছিলাম—স্নানান্তে আহার করিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্দর বাড়ীতে যাইতে হইল। তৎকালে "আনন্দ-বাজার" নামে পৃথক কোন ভোজনালয় ছিল না। অভ্যাগত যাহারা আসিত শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ীতেই

তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অন্দর বাড়ীতে কূপসংলগ্ন উত্তরের ভিটিতে যে টিনের ঘর ছিল, তাহার বারান্দায় বসিয়া আহার করিলাম। বলিতে গেলে—ইহাই তৎসময়ের "আনন্দ-বাজার"। আশ্রম গড়িয়া উঠিবার পরে সেক্রেটেরী শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র রায়, তাঁহার মা ও ভগিনী উক্ত গৃহে থাকিতেন।

এই সময়ে বাহিরের লোক অধিক ছিল না, আমাদের নিয়া মোটমাট ছয় জনের অনধিক। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের ছাড়িয়া প্রায়ই থাকিতেন না। তখন তাঁহার লীলাখেলা বালগোপালতুল্য বড়ই মধুর! আসিয়াই কাহারও কোলে বসিতেন, কাহারও বা হাঁটুর উপরে শুইয়া পড়িতেন, আদরের সহিত কাহারও গলা জড়াইয়া কথা বলিতেন, কখনো কাহাকে চুম্বন, কাহাকে নাসিকাগ্র দ্বারা স্পর্শন, কাহাকে আলিঙ্গন, কাহাকে কোলে উত্তোলন পূর্ব্বক নর্ত্তন ইত্যাদি কত যে লীলাভিনয় করিতেন—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এমনও দেখিয়াছি—স্বহস্তে ভক্তদের অঙ্গে তৈলমর্দ্দন পূর্ব্বক তিনি পদ্মায় গিয়া গাত্রমার্জ্জন করিয়াছেন, স্নানান্তে স্বহস্তে পায়ে পাদুকা পরাইয়া দিয়াছেন। এই প্রকার অভিনয়কালে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই বাণীও শুনিয়াছি—মানুষে মানুষে পরস্পর আপন ভেবে সেবা করলে তা'তে ভগবানেরই সেবা হয়"। অনেকে হয়তো এখন এই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন। কিন্তু তৎকালে যাহারাই তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাহারাই এই লীলারস উপভোগ করিয়াছেন। মহাভারত ও ভাগবতে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও কার্যকলাপ যাহা এতদিন পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি, বর্ত্তমান-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট-আমরা আজ তাহা বাস্তব প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যতো অধিক মিলামিশি, টানও ততো অধিক হইতে থাকে। যতো দেখা, ততো ভাললাগা, আরো আরো দেখিবার ইচ্ছা, একটু দূরে গেলেই যেন ভাল লাগে না, তন্মুহূর্ত্তে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হই, তৎসম্বন্ধে

আগ্রহান্বিত অনুসন্ধান—কোথায় কোন্ দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর ? আবার যে পথে যাইতেছি, সেই পথেই হয়ত তিনি দাঁড়াইয়া আছেন কিম্বা আগাইয়া আসিতেছেন, গৃহমধ্যে থাকিয়া কখন বা ঐকান্তিক চিন্তা করিতেছি, অমনি তিনি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত—এক দিব্য উন্মাদনার মধ্য দিয়া যেন অবস্থান করিতে লাগিলাম। গাছপালা, আকাশ, মাটি, যে দিকেই দৃষ্টি পড়ে তাহাতেই যেন নূতন প্রতীতি। এই প্রকার অবস্থা বেশ কয়েকদিনই ছিল। সে যেন একটা প্রচণ্ড নেশার মত! আর তাহা বেশ ভালই লাগিত। ইহাকে এক বিচিত্রবিলাস বলা যাইতে পারে। আর এক মজার কথা—শ্রীশ্রীঠাকুরের আনাগোনা, হাসি, চাহনি, প্রতি অঙ্গভঙ্গী এত মিষ্ট লাগিত যে, কেবল দেখিতেই ইচ্ছা হইত, একটু বিচ্ছেদও নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিত। বৈষ্ণব ভক্তদিগের উক্তি "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর, লাখ জনম ওরূপ নেহারিনু, তবু-না তিরপিত ভেল।" এই কথাগুলি যে কবির কল্পনা নয়, বাস্তবে যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক এই বিষয়ে কোন সন্দেহ রহিল না। ঐ সময়ে ঐ অবস্থায় "নাম" অনবরতই চলিত। চলিতে, ফিরিতে, স্নানে, আহারে, চিন্তায়, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্ব্বাবস্থায় "নাম" লাগিয়াই থাকিত। নামের গতি যন্ত্রচালিত চাকার ন্যায় দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন ছিল। জাগ্রত অবস্থাই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত, নিদ্রিত অবস্থায় যেন জাগ্রত—এইরূপ বোধ হইত। নিদ্রাবস্থায় নিত্য নূতন নূতন স্বপ্নদর্শন হইত, আর সেই প্রত্যেক স্বপ্নের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর লীলায়িত থাকিতেন। এই প্রকারের ভাব-মূর্চ্ছনা অনেকদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কথিত সময়ে আশ্রমে অবস্থানকালে কোন একদিন শেষ রাত্রিতে ধ্যান করিতেছি। অকস্মাৎ শিহরণ, ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গ কম্পন, অতঃপর কম্পনের তীব্রতা, সঙ্গে সঙ্গে গাত্র উল্লম্ফন, তদন্তর শিরা, উপশিরা, স্নায়ুর অভ্যন্তর দিয়া তুমুল প্রকম্পন ইত্যাদি কত কাণ্ড মুহূর্ত্ত মধ্যে হইয়া গেল, তাহার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া লেখনীর অসাধ্য। তৎকালে অভূতপূর্ব্ব অপরিসীম যেরূপ আনন্দরসের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা কেবল উপভোগকারীর অনুভবযোগ্য, অপরের পক্ষে কল্পনাস্বরূপ। মনে

হয়-ইষ্টাঙ্গ "নাম" করার একমাত্র প্রভাব হইতেই এই প্রকার অবস্থার অভ্যুদয়। আরো ধারণা হয়—প্রাণ ধারার উর্দ্ধগতি হইতেই ঐ প্রকার কম্পনের সৃষ্টি হইয়াছিল। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইলে পরে যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় তাহার সহিত এই অবস্থার তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যাপার সংঘটনের পর হইতে বস্তুবোধ ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানের আকাশ পাতাল তারতম্য হইয়া গেল, পূর্ব্বে যাহা দুরধিগম্য ছিল, তাহা এখন সহজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল। তদবধি মস্তিষ্কের কোষগুলি যে সতেজ ও তৎসহ অধিকতর সাড়াপ্রবন ও সাড়া-গ্রহণক্ষম হইয়াছিল—ইহা নিশ্চিতভাবে অনুভব করিতে পারিলাম।

ঐ সময়ে যতদিন আশ্রমে ছিলাম শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায় প্রতিদিনই কোন—না কোন সময়ে আমাকে ডাকিয়া নিয়া পূর্ব্বকথিত দ্বিচাল টিনের ঘরে বসিতেন। কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া কখন কখন কোমল -মধুর কণ্ঠে গানের সহিত নিজের ভাব প্রকাশ করিয়া যাইতেন। তিনি কখনও সম্পূর্ণ গান গাহিতেন না—অর্দ্ধ লাইনেই সমগ্র ভাবের অভিব্যক্তি হইত। মুগ্ধ-আমি উৎকর্ণ হইয়া উহা শুনিয়া যাইতাম, আর সেই আবেগে আমার চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু নির্গত হইত। তৎকালে আমার যে কি অবস্থা হইত—তাহা বর্ণনাতীত।—

এইমাত্র বলিতে পারি তাহা আদ্যন্ত অতীব মধুর। গানের ছন্দে ছন্দে আমি যেন তখন মিশিয়া যাইতাম। এই অভিনয় তৎকালে কেবল আমাকে নিয়াই হইত। এই প্রকার মিলামিশার মধ্য দিয়া একদিন আমার ঐ সমস্ত সঙ্গীত সম্পর্কে প্রসঙ্গ তুলিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উহা শুনিতে চাহিলেন। তাঁহার প্রীতি-উদ্দেশ্যে আমিও কয়েকটি গান গাহিলাম। তখন তিনি ঐ সমস্ত গান ছাপানের কথা বলিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশমতে **সন্তগীতা** নাম দিয়া ঐ সমস্ত সঙ্গীত ছাপান হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের প্রথম প্রকাশ—১৩২৮ সনের ১৮ই কার্ত্তিক। পুরাতন সৎসঙ্গীগণ সকলেই **সন্তগীতার** বিষয় জানেন। এই গীতিপুস্তিকা মুদ্রণকার্যে সঙ্ঘভ্রাতা শ্রদ্ধেয় মোহিনীমোহন শাস্ত্রী পচিশ টাকা অবদান করিয়াছিলেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য সন্তগীতার প্রথম
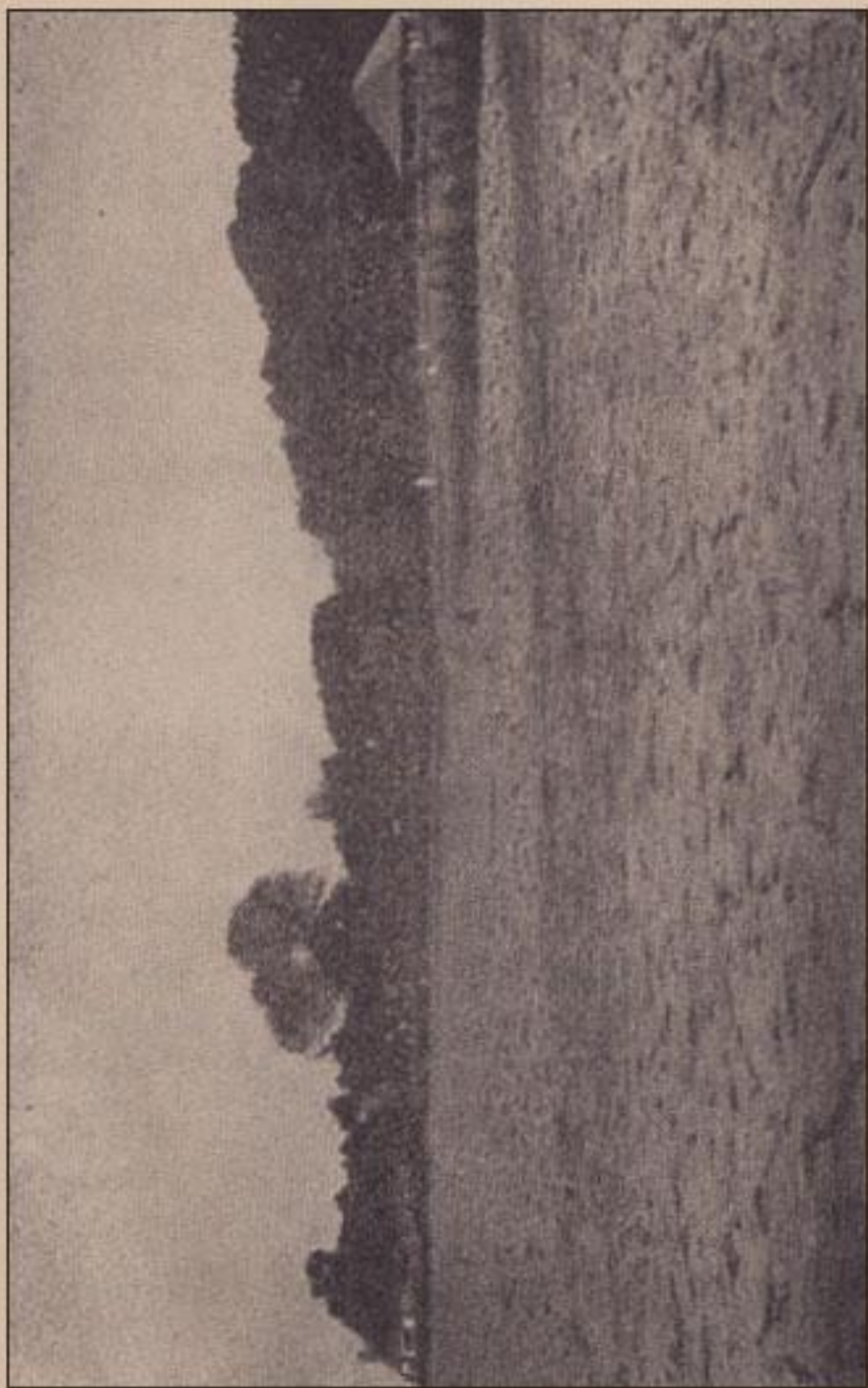
গানটি ও শেষের একটি গান এইস্থলে দেওয়া হইল। তখন সেই মহাসংকীর্ত্তনের যুগ। কীর্ত্তনের মধ্য দিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের যাবতীয় ভাবধারা বিস্তারিত হইত। তজ্জন্যই এই প্রকার গীতিপুস্তিকা প্রকাশের তখন প্রয়োজন ছিল।

প্রথম গান—

কে গো বাজালে বাঁশী
মরম ভিতরে পশি
আকুল করিল প্রাণ
মধুরে মধুরে।

বিস্মৃতে স্মৃতির দান
এ গানের প্রতি তান
নিয়ে গেল দিয়ে টান
বেঁধে সুরে সুরে।

আমি আর নহি আমি
যেন কার অনুগামী
এসেছি স্বপন দেশে
কোথা কোন্ পুরে?

সে এক নূতন বিশ্ব
প্রীতিপূর্ণ সব দৃশ্য
নয়নে লেগেছে তাক
পলক না পড়ে।

এত যার প্রাক্ ভাগে
উল্লসিত অনুরাগে
আরো না কতই হবে
পে'লে সে বঁধুরে।

কি জানি কি অনুপম
প্রিয় হ'তে প্রিয়তম
নিকটে এসো গো মম
থেকোনা হে দূরে।

———

দ্বিতীয় গান—

এখনো বনমাঝে বাঁশরী বাজে গো।
মধুরে মনোমাঝে নূপুর বাজে গো।
আসে বনমালী করে কেলী, নাচে গায়,
কুলু কুলু যমুনা উজান বয়ে যায়।
রাধারাণী আসে ছুটে, ব্রজে সে চাঁদ উঠে,
চিদঘন-কায় সাজে মদনমোহন গো।
আসে সে তরঙ্গ, পরাণে সে লাগে,
দিবানিশি অনুরাগে সে ভাবে যে জাগে,
নিত্য বাজায় বাঁশী সেথা লীলাধিপ গো।
রাধা-রাধা-রাধা-রাধা-রাধা-রাধা নাদে গো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিক্ষণ এই প্রকার সঙ্গ পাইয়া সেই যাত্রা আশ্রমে দিনগুলি অতিশয় আনন্দের মধ্য দিয়াই যাইতেছিল। গাবতলার ঘরেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত অধিক সময় মিলামেশা হইত। গাবতলার ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। এমন সময়ে একদিন ইঞ্জিনীয়ার শ্রীশচন্দ্র নন্দী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন প্রাতঃ আটটার অনধিক। তাহাকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর জানিতে চাহিলেন তাহার শরীর কিরকম আছে। শ্রীশদা বলিলেন—হাঁপানির টান বাড়িয়াছে। তাহাকে ঔষধ দেওয়ার জন্ত তখন শ্রীশ্রীঠাকুর আমার প্রতি নির্দ্দেশ দিলেন। ঔষধ নির্বাচন করিয়া দেওয়ার জন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলাম। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর এই উক্তি করিলেন—আপনি এত ঔষধের আবিষ্কারক! আপনি ঔষধ দিলেই সেরে যা'বে। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের এক বন্ধুব্যক্তি আসিয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন শ্রীশদাকে অন্যত্র গিয়া আমার সহিত ঔষধ সম্পর্কে পরামর্শ করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ইঙ্গিত করিলেন। তদনুসারে একটু তফাতে গিয়াই শ্রীশদা

আমাকে বলিলেন—সবে মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আপনার যোগাযোগ, তাঁহার ইঙ্গিত বুঝে চলা এখনও সময়সাপেক্ষ। আপনার প্রতি আদেশ ঔষধ দেওয়ার, আপনি যাহা দিবেন তা'তেই আমি রোগ-মুক্ত হব—এ বিশ্বাস আমার আছে। অগত্যা আমি তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া অজানিত কোন আগাছার একখানা সরু ডাল ভাঙ্গিয়া চারিটি টুকরা করিলাম। তাহা হইতে তিন টুকরা পর পর তিনদিন বাটিয়া সেবন করার কথা বলিলাম; আর অবশিষ্ট এক টুকরা মাদুলিতে ধারণপূর্বক নিত্য স্নানকালে "নাম"সহ জল পানের ব্যবস্থা দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাক্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী হইয়া তিনি তখন অতিশয় আগ্রহের সহিত ঐ দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। যথা সময়ে শ্রীশদা উহা সেবন ও যথাযথ ভাবে মাদুলিতে ধারণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীশদার সহিত আমার ঢাকাতে সাক্ষাৎ হয়। তখন জানিতে পারিলাম ঐ ঔষধেই তিনি রোগ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এইস্থলে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রীশদার অটুট বিশ্বাসই যে ঐ প্রকার ফল প্রাপ্তির একমাত্র হেতু—ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মদেশ হইতে দেশে আমার প্রত্যাগমনের কিছুদিন পরেই তাহার সহিত এই সাক্ষাৎকার। এই প্রসঙ্গের সহিত শ্রীশদা সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। তিনি রেলওয়েতে চাকুরী করিতেন। অসুস্থতার দরুণ দীর্ঘদিনের ছুটি নিয়া তৎসময়ে আশ্রমে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাড়ীর নবগৃহাদি নির্মাণ, পুরাতন গৃহের সংস্কার, সিমেণ্ট বাঁধাই ইত্যাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ—ইহাই ছিল তখন তাহার একমাত্র কর্ম। *

শ্রীশদার এই ঘটনার ন্যূনাধিক দুই তিন বৎসর পরে আমি নিজেই অকস্মাৎ হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হই। ইহার পূর্ব পর্যন্ত আমি একাদিক্রমে পূর্ণ তিন

---

* ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার কৃত "জননী মনোমোহিনী ও শ্রীশ্রীঠাকুর" নামক পুস্তকের ১৩১ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

বৎসরকাল ব্রহ্মদেশে যাজনে নিযুক্ত ছিলাম। তথা হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েক মাস পরেই আমার এই রোগের সূচনা। প্রায় ছয় মাসকাল ভোগের পরে আমি চিকিৎসার্থ কলিকাতা গেলাম। উদ্দেশ্য—মাষ্টারদার নিকট হইতে ব্যবস্থা নিয়া তাঁহারই চিকিৎসাধীন থাকিয়া চিকিৎসা করান। যাঁহার কথা বলা হইতেছে—ইনিই আমাদের সকলের শ্রদ্ধার্হ ডাঃ শশীভূষণ মিত্র—এল-এম-এস। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ন্যাশনেল মেডিকেল ইন্‌ষ্টিটিউশনের ছাত্র, তৎকালে মাষ্টারদা ঐ কলেজের ফিজিওলজীর অধ্যাপক।

কালক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরও প্রকট হইলেন। এদিকে সদ্‌গুরু আবির্ভূত হইয়াছেন শুনিয়া মাষ্টারদাও এই সময়ে দীক্ষিত হইলেন। দীক্ষা হইয়াছিল বেলেঘাটা—১৩২৬ সনের ২৭শে মাঘ তারিখে। অতঃপর তিনি ইষ্ট দর্শন করিতে আসেন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর সসম্মানে "স্যার" সম্বোধন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইয়া পরে পরিচয় দিলেন—তিনি যে তাঁহার ছাত্র। ইহাতে মাষ্টারদা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত না হইয়া বরং শ্রীশ্রীঠাকুরের কমনীয় প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শনে আরো অধিকতর আকৃষ্ট হইলেন। আর গভীর অভিনিবেশ সহ পুনঃপুনঃ তাঁহার দিব্যকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইত হইল প্রথম অভিনয়—মাষ্টার আর ছাত্রে, গুরু আর শিষ্যে। ইহার পরে আরও দেখিয়াছি—মাষ্টারদা আশ্রমে যখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে আসিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাষ্টারদাকে আগে আসন দিয়া তারপরে নিজের আসন গ্রহণ করিতেন। সাক্ষাতে মাষ্টারদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর "স্যার" বলিতেন। আর অনুপস্থিতে তাঁহার সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন হইলে সম্মানসূচক 'মাষ্টার' মহাশয় বলিতেন। বহুক্ষেত্রে দেখিয়াছি সম্মানের পাত্রকে কি ভাবে গ্রহণ করিতে হয়, নিজের আচরণের মধ্য দিয়া সেই শিক্ষা শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বদাই দিয়া থাকেন। মাষ্টার'দার প্রতি এই প্রকার ব্যবহার তৎসম্বন্ধীয় একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

চিকিৎসার্থ যে সময়ে আমি কলিকাতা গিয়াছিলাম তৎকালে মাষ্টারদা

মাণিকতলা ওরিয়েণ্টেল মেডিকেল হলের পর্য্যবেক্ষক ডাক্তার। তাঁহার সহিত অপর পর্য্যবেক্ষক ছিলেন ডাঃ যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—তিনিও সৎসঙ্গী। উক্ত ওরিয়েণ্টেল ফার্ম্মাসীর মালিক নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। তিনিও পুরানো সৎসঙ্গী। মাণিকতলার এই প্রসঙ্গের সাথে অপর একজন বিশিষ্ট সৎসঙ্গীর কথা মনে পড়িতেছে—তিনি হীরালাল দাস। মাণিকতলা মেইন রোডেই তাহার বাড়ী। তিনি প্রেমিক ও রসিক দুই ছিলেন। সতর কি আঠারো বৎসর বয়সের সময়ে কিছুকাল তাহার ভাগ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গ করার সুযোগ হইয়াছিল। হীরালালদা পরমহংসদেবের নিকট হইতে তৎকালে উপদেশও নিয়াছিলেন। হীরালালদার মুখে পরমহংসদেবের কথা অনেক শোনা গিয়াছে। পরমহংসদেবের তিরোধানের পরে তিনি অতিশয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। অধিকন্তু ঐরূপ জীবন্ত একজন মহাপুরুষের সঙ্গ পাওয়ার আকাঙ্খাতে নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠেন। এই অবস্থায় তাহার দীর্ঘ কয়েক বৎসর চলিয়া যায়। অতঃপর হীরালালদা মাষ্টারদার নিকটে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিতে পাইয়া, তাঁহাকে দেখার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হন। কথিত সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিতকী বাগানে ছিলেন। মাষ্টারদা একদিন হীরালালদাকে সাথে নিয়া হরিতকী বাগানের বাড়ীতে যান। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শনমাত্র তাহার এই বোধ হইল—তিনিই তাহার চির—আকাঙ্খিত। তখনই নতজানু হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সমক্ষে তিনি তাহার আবেগ-আবেদন জানাইতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও তদবস্থায় তাহাকে সাদরে জড়াইয়া ধরিয়া কয়েকবার "নাম" শোনাইলেন। তদবধি হীরালালদা শ্রীশ্রীঠাকুরগত প্রাণ হইয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত ছিলেন। তিনি একটি প্রাইভেট কার্য্যের ম্যানেজার ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও প্রায়ই ছুটি নিয়া তিনি হিমাতপুর যাইতেন। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যেই অধিক সময় থাকিতেন। হীরালালদার মাণিকতলার বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শুভ পদার্পণ কয়েকবারই হইয়াছিল। মহারাজ, গোঁসাইদা, সুশীলদাও তাহার বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাহার

কনিষ্ঠ ভ্রাতা যোগেন্দ্রলাল দাসের স্ত্রীর দীক্ষা উপলক্ষে জননীদেবীর সহিত একবার আমিও তাহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম।

আশ্রমের প্রাথমিক অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের থাকার জন্য একখানা নির্দিষ্ট উত্তম গৃহ হীরালালদার পরিকল্পনা হইতেই নির্মিত হইয়াছিল। সেই গৃহ নির্মাণকল্পে তিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া অন্যান্য সৎসঙ্গীদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই কার্য্যে তাহার নিজের অবদানও যথেষ্ট ছিল। হীরালালদা রসিক ও বিচক্ষণ দুই ছিলেন। যেখানেই বসিতেন সেখানেই মজলিস জমিয়া উঠিত। সৎসঙ্গ মতবাদের হিন্দি পুস্তকাদি তাহার অনেক পড়াশোনা ছিল। এখনো তাহার বাড়ীতে হিন্দি পুস্তকে আলমারি ভর্ত্তি। এখন তিনি জীবিত নাই বটে, কিন্তু তাহার ঠাট সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে হীরালালদা মাণিকতলা নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাহার শেষ প্রয়াণ সজ্ঞানে হইয়াছিল। মাষ্টারদা মৃত্যু সময়ে সন্মুখে ছিলেন।

পূর্বে যাহা বলিতে ছিলাম—আমাকে পরীক্ষান্তে মাষ্টারদা সোয়ামিন ইঞ্জেকশন ব্যবস্থা করিলেন। তখন তাঁহারই চিকিৎসাধীন থাকিয়া সেই রোগ হইতে আমি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলাম। মাষ্টারদার গুণের কথা কত বলিব!—যেমন সুপুরুষ, তেমনি ছিলেন তিনি বিনয়ী। আচার, ব্যবহার, চালচলন, কথার মাধুর্য্য ও ইষ্টকর্ম্মে সর্বদিক দিয়া এই দেবপুরুষের যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বহুদিন কলিকাতা সৎসঙ্গের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এখন তিনি সশরীরে ধরাধামে নাই বটে কিন্তু তাঁহার পুণ্যস্মৃতি প্রত্যেক পুরাতন সৎসঙ্গীর মধ্যে নিত্য জাগরূক রহিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি মাষ্টারদার কি অসাধারণ অনুরক্তি ও অপূর্ব্ব ভক্তি ছিল, তাহা যাহারা দেখিয়াছেন তাহারাই জানেন।

চিকিৎসা ব্যতীত মাষ্টারদা দ্বারা আমি অন্য প্রকারেও উপকৃত। আমার

জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রফুল্ল ইংরাজী ১৯২১ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পরে তাহাকে ঢাকা মিডফোর্ড মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করার জন্য চেষ্টা করা হয়। তাহাতেও সুপারিশ প্রয়োজন। এই কারণে বন্ধুস্থানীয় দু'একজনার সহায়তা লওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—শরৎবিহারী নন্দী আমার একজন বন্ধুব্যক্তি। সেই সূত্রে তাহার ভ্রাতষ্পুত্র যোগেন্দ্রলাল নন্দীর সহিতও আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। যোগেন্দ্রলাল নন্দী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। চাকুরী উপলক্ষে তিনি এক সময়ে জলপাইগুড়ী ছিলেন। সেই সময়ে যাজন উদ্দেশ্যে আমিও জলপাইগুড়ী গিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে আমি তাহার বাসায় ছিলাম। তখন তিনি আমার নিকট হইতে এই "সৎনাম" গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই পাবনা টাউনে তাহার বদলী। পাবনা থাকা কালে যোগেনদা প্রায়ই আশ্রমে যাওয়া আসা করিতেন। যোগেনদার জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার নন্দী—সেও গ্রাজুয়েট। একদিন প্রসঙ্গক্রমে প্রফুল্লের ভর্ত্তির কথা উঠিতেই. সুকুমার বিষয়-বৃত্তান্ত সমস্ত জানিয়া নিল। অতঃপর সে এই মন্তব্য প্রকাশ করিল—এই সম্পর্কে যাহা প্রয়োজন সে করিবে। সুকুমারের এইরূপ নিশ্চয়তা দেওয়ার হেতুও ছিল। সে ভাগ্যকুলের বিখ্যাত ধনকুবের কুমার প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর ভাগিনেয়। ঢাকা-মিডফোর্ড হাসপাতালে ও মেডিকেল স্কুলে উক্ত রায়চৌধুরীদিগের যথেষ্ট দান ও বার্ষিক সাহায্য আছে। এই কারণে ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের অসামান্য প্রতিপত্তিও ছিল। অধিকন্তু, তাঁহাদের মনোনীত নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ছাত্র মেডিকেল স্কুলে ভর্ত্তি করার অধিকার ছিল। সুকুমার আমার ছেলের জন্য তাহার মাতুলের নিকট অনুরোধ করিয়াছিল। কুমার বাহাদুর ভাগিনেয়ের কথা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং মিডফোর্ডের সিভিল সার্জন সাহেবের নিকট একখানা অনুরোধ পত্রও দিয়াছিলেন। সেই পত্র আমাদের হাতে যথাসময়ে আসিয়াছিল। ভর্ত্তির পূর্ব্বে মার্ক-সিট দেখান একান্ত প্রয়োজন। তাই বহু পূর্ব্বেই মার্ক-সিটের জন্য

মণি-অর্ডারে টাকা পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সময় উত্তীর্ণ করিয়া মার্ক-সিট পাঠানের হেতুতে সমস্ত সুযোগ নষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর ছেলেকে সেনেটারী ট্রেইনিং ক্লাসে ভর্ত্তির চেষ্টা করা হয়। এই সময়েই মাষ্টারদা তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষভাবে ধরেন। তিনিও স্বাস্থ্য-বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার ছিলেন। তখন তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্য-কারণ-হেতু পূর্ব্বাবধি জন-স্বাস্থ্য-বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর সি, এ, বেণ্টলীর সহিত তাহারও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাষ্টারদার অনুরোধক্রমে কৃষ্ণমোহনবাবু বেণ্টলী সাহেবের বাসায় গিয়াও ছিলেন। কিন্তু বাসায় গিয়াও কোন কাজ হইল না কারণ সাহেব তখন দার্জ্জিলিং। সাহেব কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই তথায় ভর্ত্তির সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পুনঃ পুনঃ এই প্রকার সুযোগ ব্যর্থ হওয়ায় মনে হইল—ছেলের অদৃষ্ট ভাল নয়। ইহারই সাত আট মাস পরে বেণ্টলি সাহেব দৈবাৎ আমাদের পাইকারা গ্রামের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই ঘটনা ১৩৩৫ সনের মাঘ মাসে। মিঃ বেণ্টলির সাথে স্যার ম্যালকোহম, ডাঃ আয়েঙ্গার, আর ডাঃ সুর ছিলেন। উঁহারা সকলেই জন স্বাস্থ্য বিভাগের। উঁহাদের মধ্যে হেড ছিলেন স্যার ম্যালকোহম। তিনি বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন।

এতদ্দেশে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটী ঐ সময়ে গঠিত হইয়াছিল। উহার পরিচালনার ভার ছিল স্যার ম্যালকোহমের উপর। এই কার্য্যেই রত হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেথাকেন। এই উপলক্ষেই তাঁহারা রাজবাড়ী আসেন। তথা হইতে গোয়ালনন্দ আসিয়া ষ্টিমারে তারপাশা নামেন। তারপাশা ঘাট হইতে হাটিতে হাটিতে অকস্মাৎ আমাদের বাহির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। মিঃ বেণ্টলীকে দেখিয়াই আমি চিনিতে পারিলাম। কারণ কয়েক মাস পূর্ব্বেই মিঃ বেণ্টলী আর মিঃ এ, ডি, ওয়েষ্টন উভয়েই আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের

জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে চিনিয়া রাখিয়াছিলাম। বেণ্টলী সাহেবের নিকট আমার পরিচয় দিলাম। সৎসঙ্গের নাম বলামাত্র মিঃ বেণ্টলী উৎসাহের সহিত বলিলেন—"I know Satsang. This is a very useful institution. Thakur is a very great Man. I went to the institution on occassion of Thakur's Birthday Anniversary." অতঃপর তাঁহাকে আমার ছেলের বিষয় বলিলাম। তাহার বন্ধু কে, এম বানার্জ্জি যে এইজন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও জানাইলাম। ছেলে ভর্ত্তি হইতে পারে নাই শুনিয়াই তিনি ছেলেকে দেখিতে চাহিলেন। প্রফুল্ল ওখানেই ছিল। তাহাকে দেখিয়া নিয়া সাহেব তখনই একখানি কাগজে নোট লিখিয়া দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—"On Sir Malcohom's honourable visit, Profulla Kumar Chakraverty, son of Preacher T. N, Chakraverty of Paikara P S. Lohajang, Dacca, is admitted into the Sanitary Training for the next July session." Sd./C. A. Bently. লিখিত কাগজখানা দিয়া সাহেব বলিলেন—"This is admission." (এই ছেলের ভর্ত্তি)। সেশন আরম্ভের পূর্ব্বে যেন ঐ নোটসহ দরখাস্ত পাঠানো হয় এই পরামর্শও তিনি দিয়া গেলেন। এই নোটের অন্তবলে আমার ছেলে ভর্ত্তি হইতে পারিয়াছিল। ঐ বিষয় জানার জন্য প্রফুল্ল রাইটার্স বিল্ডিং-এ জন-স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসে যখনগিয়াছিল, সেই সময়ে কেরাণীবাবু নথী দেখাইয়া তাহাকে ইহাও জানাইয়া ছিলেন—সাহেব নিজেই তাহার দরখাস্তে ভর্ত্তি সম্পর্কে লাল-চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই ঘটনায় গ্রামের লোকদিগের মধ্যে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরিসীম দয়ায় অপ্রত্যাশিত ভাবে এইরূপ সংঘটন যে হইয়াছে ইহাও অনেকের মুখে তখন শুনিতে পাইলাম। বন্ধুস্থানীয় কেহ কেহ তখন হাস্যমুখে ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন—যার কাছে দরবারের জন্য এত দিন ব্যগ্র ছিলে, সেই লোক নিজেই আজ তোমার দরজায় উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের

একান্ত হয়ায় যে এই প্রকার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল—এই ধারণা আমারও না ছিল এমন নয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে হিমাইতপুর আশ্রম দেখিয়া মিঃ বেণ্টলী আর মিঃ ওয়েষ্টন যে মন্তব্য লিখিয়া ছিলেন তাহার একাংশ নিম্নে দেওয়া হইল।

"I was much impressed by all that I saw

Sd/ C. A. Bently,
Director of Public Health, Bengal.
19. 9. 28.

"I was much impressed with the enterprising social and development work going on under the inspiration of its founder. I gladly pledge sympathy and help of the department of Industries within its capacities and resources in the future."

Sd/ A. D. Weston
Director of Industries, Bengal.
16. 9. 28.

পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—নিত্য নূতন রসপরিপূর্ণ এই সমস্ত ভাবরাজি উপভোগের মধ্য দিয়া আশ্রমে দিনগুলি বেশ ছন্দে ছন্দে যাইতে ছিল। বলিতে পারি—এই আনন্দের যেন তুলনা নাই। এই সময়েই একদিন অপরাহ্নে শ্রদ্ধেয় সুশীলদা (বসু—বর্ত্তমানে সত্যার্থী ঋত্বিক), পূর্ণচন্দ্র সাহা বি এ—বি এল, (অন্থকুল হোসিয়ারীর সত্ত্বাধিকারী), পূর্ণ কবিরাজ বি এ (কুষ্টিয়া), নফরচন্দ্র ঘোষ (আনন্দ বাজারের আদি সেবক) প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশেপাশে বসিয়াছেন। তথায় নানা কথাবার্ত্তা হইতেছে, আমিও শুনিয়া যাইতেছি। যে স্থানে বসিয়া এই সমস্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল পরবর্ত্তীকালে সেই স্থানেই ঋত্বিক অফিসের সুদীর্ঘ দালান নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎকালে ঐ স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, মাঝে

মাঝে ঝোপ জঙ্গল ছাপ করিয়া বসিবার উপযোগী স্থান মাত্র করা ছিল। আর ঐ সমস্ত ফাঁকা জায়গার মধ্যে দু'চার খানা বাঁশের মাচা ছিল। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ চলিয়াছে। এমন সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র দাস কাশীপুর হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বাহিরে প্রচারকের আবশ্যকতা নিয়া তখন কথা উত্থাপিত হইল। ভাবভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলাম আমাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহারা এই প্রস্তাব তুলিয়াছেন। জেলায় জেলায় আমি তখন বক্তৃতা দিয়া থাকি সুতরাং আমাদ্বারা যে বাহিরের প্রচারকার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে, ইহাই তাঁহাদের মনোগত ভাব। শ্রদ্ধেয় সুশীলদাও ঐ কথার সমর্থনে আমার নাম উচ্চারণ করিলেন। তাঁহাদের এই আলাপন শুনিয়া অনুনয়ের সহিত আমি বলিলাম—"সবে মাত্র সৎসঙ্গে যোগদান ক'রেছি, এখনো অনেক বিষয় জানার বাকী আছে, বুঝে শুনে একটু পাকা হ'লে পরে বরং আমাদ্বারা কাজ হ'তে পারে। তন্মুহূর্ত্তেই শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহপূর্ণ ভাব প্রকাশে এই উক্তি করিলেন—"আগুণ ধরান হয়ে গেছে, এখন লে'গে গেলেই হয় হনুমানের মতো, লেজ-মুখ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলেও লঙ্কা জয় করা চাই-ই। একবার লে'গেই দেখুন-না, দা! তখন বোঝা যাবে। তৎক্ষণাৎ নত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের এই আদেশ গ্রহণ করিলাম। আর সৎসঙ্গের ভাবধারা বিস্তার ও যাজনে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প প্রকাশ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই নির্দ্দেশ পাওয়ার পরেও কয়েকদিন আশ্রমে রহিলাম। ইতিমধ্যে আমার সাথী সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দীক্ষা নিলেন। অতঃপর বাড়ী আসিবার দিন প্রণাম করিয়া রওনা হওয়ার প্রাক্কালে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার স্ত্রীকে নাম দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। তৎসঙ্গে আরও সচেতন করিয়া দিলেন—"যতো আগে—ততো ভাল।"

আশ্রম হইতে দিনের ষ্টীমারে কুষ্টিয়া আসিলাম। তথা হইতে লোক্যাল ট্রেনে কুমারখালি ষ্টেশনে নামিলাম। ওখানে নামিবার হেতু আম ক্রয় করা। আশ্রমে আসার সময়ে দুইজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি বিশেষ অনুরোধ করিয়া

আম নেওয়ার জন্ত টাকা দিয়াছিলেন। আম ক্রয় করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ষ্টেশনে ফিরিলাম। সন্ধ্যায় বিনতি প্রার্থনান্তে কিছু জলযোগ করিয়া আমি ও সতীশদা পাশাপাশি শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি তিনটায় গাড়ী। সুতরাং ঘুমাইবার যথেষ্ট সময় ছিল। শোয়া-অবস্থায় নাম করিতেছি কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছে না, নিদ্রার আবির্ভাব হইয়াও স্থায়ী হইতেছে না! অভূতপূর্ব্ব নানাপ্রকার শব্দ আসিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া দিতেছে। এপাশ ওপাশ হইয়া দেখিলাম শব্দের কিছুতেই বিরাম হইতেছে না। কাঁসর-ঘণ্টা-শঙ্খের নানাপ্রকার মিশ্রিত শব্দ কানে লাগিয়াই আছে। কোথা হইতে এই সব শব্দ আসিতেছে নিশ্চিত হইবার জন্ত তখন সাথী সতীশদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কোন শব্দ পাইতেছেন কিনা? উত্তরে তিনি "না" বলিলেন। শব্দে মনোনিবেশ করিয়া তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম ঐ প্রকার ঝঙ্কার আমার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেই হইতেছে। ঘুম আর হইল না। এই প্রকার অভিনয়ের মধ্যদিয়া রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। এদিকে গাড়ী ও আসিয়া পড়িল। আমরা উভয়ে তখন গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। গাড়ীতে বসিয়াও চিন্তা করিতে থাকিলাম, এই প্রকার ঝঙ্কার হওয়ার কারণ কি? তখনই তাহার মীমাংসা পাওয়া গেল। কুষ্টিয়াতে প্রথম সাক্ষাৎ হওয়ার পরেই আলোচনার মধ্যদিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন —সাধনার পথে কিছু অগ্রসর হ'লে এই শব্দ স্পষ্টভাবে ভিতরে শোনা যায়। সৎগুরু-বাক্যের সত্যতা ও সৎগুরু-সঙ্গলাভের সম্যক মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই ঘটনা হইতে পাওয়া গেল। বাড়ী গিয়া পুণ্যপুঁথি দেখিলাম। তাহাতে আরো স্পষ্ট প্রমাণ পাইলাম।—"শব্দ প্রথমে একটু একটু শোনা যায়, ডান পাশে নয়, সোজাসোজি একটু ডাইনে। শব্দের মধ্যে বিশেষত্ব আছে লক্ষ্যকরা লাগে। একটু পরে Bell Sound (ঘণ্টার ধ্বনি) পাওয়া যায়। ওঁ ছেড়ে যেতে হবে-ওঁত কাছেই।......একটু উপরে উঠলে বাঁশী শোনা যায়, শুনলে ফিরে আসে না রে, তখন আমার

পাশাপাশি, তারপর আমার কাছে, পরে আমিও নাই—তুমিও নাই"।

(মহাভাববাণী)

তখন বুঝিতে পারিলাম—ইষ্টানুগ নামের প্রভাব হইতেই শব্দের ঐ প্রকার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। কিন্তু ইষ্টানুগ টানের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেও ঐ প্রকার সাড়শীলতা বেশী দিন থাকে না। প্রকৃতপক্ষে মনে রাখিতে হইবে পুরুষোত্তম শ্রীবিগ্রহই আমাদের প্রধান ঈপ্সিত। তাঁহাকে আপ্রাণ ভালবাসা, একান্ত হইয়া তৎপ্রীতিকর কর্ম্মে লাগিয়া থাকা, তদনুপ্রাণনায় তাঁহারাই যাজন ও সেবা করা, অনুরাগের সহিত নিয়মিত নামধ্যান, সদাচার-পরায়ণতা—এই সমস্তই প্রকৃত সাধনার অঙ্গ ও উন্নয়নের মুখ্য সোপান। পাঠকগণের আরো স্পষ্টভাবে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বীয় মুখ নিঃসৃত বাক্য এই সঙ্গে দেওয়া গেল। **সাধনায় চরিত্র**—সাধন প্রক্রিয়ার ক্রমাগত চেষ্টা ও অভিনিবেশে শব্দ, জ্যোতিঃ. দৈববাণী ইত্যাদি যোগবিভূতি যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে সে গুলি শুধু তোমার মস্তিষ্কের বৈধানিক পরিবর্ত্তনই নির্দ্দেশ করে। ইহা তোমার প্রকৃত সত্ত্বা ও চরিত্রকে স্পর্শ নাও করিতে পারে, কিন্তু আদর্শে ভক্তি বা ভালবাসার অকাট্য টানে বা তৎসহ যৌগিক প্রক্রিয়ায় যাহা সংঘটিত হয়, তাহা সত্ত্বা ও চরিত্রকেই আকর্ষণ করিয়া উন্নতিতে নিয়ন্ত্রিত করে (**চলার রীতি**)। —স্থির নিশ্চয়।"

এখন আগে যাহা বলিতেছিলাম—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া গোয়ালনন্দ ঘাটে ষ্টিমারে উঠিলাম। হাত-মুখ ধোয়ার পরে চা পান করিয়া যখন যাত্রীগণ প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিয়াছে, তখন এদিক সেদিক দেখিয়া নিয়া অনন্তর মনোনীত একস্থানে গিয়া যাত্রীদের কাছে বসিলাম। কথার পৃষ্ঠে কথারছলে আলোচনা সুরু করিলাম। আর সুযোগ বুঝিয়া মাঝে মাঝে "পুণ্যপুঁথি" হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করিয়া শোনান ও সেই সঙ্গে চলিল। কিছুক্ষণ পরেই অপরিচিত এক যুবক

আসিয়া আমাদের সাথে যোগদান করিলেন। আর মনোযোগের সহিত কথাবার্ত্তা শুনিতে থাকিলেন। সর্ব্ব শেষে তিনি এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন— অনেক মহাপুরুষের কথা অনেকের কাছে শুনিয়াছি, দুএকজনার সাথে দেখাও করিয়াছি কিন্তু তৃপ্তি পাইনাই। আপনার কথাগুলি প্রত্যয়যোগ্য, সুযোগমতে যত সত্বর সম্ভব একবার হিমাইতপুর আশ্রমে যা'ব।" সে তাহার কথা রক্ষা করিয়াছিল। যথা সময়ে আশ্রমে গিয়াছিল এবং দীক্ষাও নিয়াছিল। ইনিই মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার যাজনের প্রথম সৎসঙ্গী। দীক্ষা নেওয়ার পরে মনিদা দীর্ঘ কয়েক বৎসরই আশ্রমে ছিলেন। তিনি পরে প্রতি ঋত্বিকের পাঞ্জাও পাইয়াছিলেন। এইরূপ আলোচনার মধ্য দিয়াই ষ্টিমারও গিয়া তারপাসা ঘাটে পৌছিল। তখন বেলা প্রায় দশটা। আমি ও সতীশদা ওখানে নামিলাম। আর মনিদা ঐ ষ্টিমার হইতে নামিয়া মাদারীপুর ষ্টিমারে উঠিয়া নিজ গন্তব্যস্থান চেউখালি চলিলেন।

আমরা বাড়ীতে প্রায় এগারটায় পৌছিলাম। প্রণামান্তে মাকে বলিলাম। তোমাদের বউকেও "নাম" নিতে হবে—শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমান হইল—তাহারও মাছ খাওয়া চলিবে না।" মা অমনি বলিয়া ফেলিলেন—তোর আশ্রমে যাওয়ার পর হইতে বউমার মাছে অরুচি হ'য়েছে, গন্ধ পায়, আর খে'লেও বমি আসে। মনে মনে ভাবিলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় ভালই হইয়াছে। সেই দিনই আনুপুর্ব্বিক বিবরণ সহ আশ্রমে পত্র দেওয়া হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুসারে মহারাজ ফেরত তাকেই দীক্ষার উপদেশপত্রসহ উত্তর পাঠাইলেন। তদনুসারে একই সময়ে আমার স্ত্রী ও স্বগ্রামবাসী সরোজিনী দেবীনাম্নী এক বিধবা মহিলা "নাম" নিলেন।

আশ্রম হইতে বাড়ী আসিয়া পরেরদিন অপরাহ্নে ভাগিনেয় আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ঝাউটীয়া গেলাম। ঐ গ্রামেই তাঁহার বাড়ী। আমাদের বাড়ী হইতে মাত্র অর্দ্ধমাইল ব্যবধান। জ্যেষ্টতাত ভগ্নীর দিক

দিয়া তিনি সম্পর্কে ভাগিনেয়। তিনি আমা অপেক্ষা ন্যূনপক্ষে ত্রিশ বৎসরের বয়োধিক। ইনি সন্তমতের তৃতীয় গুরু মহারাজ সাহেবের নিকট হইতে বেনারসে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন নিজেই সেই প্রণালীতে দীক্ষা দিয়া থাকেন। সন্তমতের সাধনা পাওয়ার পূর্ব্বে আশুতোষ প্রাণায়াম যোগাভ্যাসী ছিলেন। তিনি প্রাণায়াম যোগ্যভ্যাস শিক্ষাও দিতেন। আমাদের প্রবীণ সৎসঙ্গী সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বে আশুতোষের নিকট হইতে প্রাণায়াম অভ্যাস নিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই অভ্যাস অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য বিধায়, অধিকন্তু বহুদিন অভ্যাস করা সত্বেও বিশেষ ফল না পাওয়াতে,অতঃপর সুরেশদা সদ্গুরুর অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে মহারাজ সাহেবের সংবাদ পাইয়া ৺কাশীধামে গিয়া সন্তমতের সাধন-প্রণালীতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে ভাগিনেয় আশুতোষ তাঁহার কোন প্রয়োজন উপলক্ষে কলিকাতা যান। তখন তিনি পূর্ব্ব সম্পর্কসূত্রে সুরেশদার বাসায় গিয়া উঠেন। তাঁহার নিকট হইতে মহারাজ সাহেবের সংবাদ অবগত হইয়া আশুতোষ কাশীধামে চলিয়া যান এবং এই দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেই সময়ে মহারাজ সাহেব অন্তিম শয্যাশায়ী। আশুতোষ ডাক্তার ও চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী জানিতে পারিয়া মহারাজ সাহেব তাঁহাকে নিজের শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। আশুতোষের ঐকান্তিক সেবাপরায়ণতায় মহারাজ সাহেব অতিশয় প্রীত হন। এই অন্ত মহারাজ সাহেব সকল সময়ে তাঁহাকে কাছেই রাখিতেন। এই প্রকারে আশুতোষ পূর্ণ এক বৎসর কাল ইষ্টসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রতিনিয়ত ইষ্টের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সময়েই মহারাজ সাহেব তাঁহাকে দীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেন। মহারাজ সাহেবের তিরোভাবের পরেই আশুতোষ দেশে চলিয়া আসেন। তদবধি নিজের বাড়ীতে সৎসঙ্গ অধিবেশনকেন্দ্র স্থাপন করিয়া এই মত প্রচার করিতে থাকেন। তিনি সৎসঙ্গী আমার জানা ছিল—সেই কারণেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে

গেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতেই তিনি অতিশয় আগ্রহের সহিত জননী মনোমোহিনী দেবীর (শ্রীশ্রীঠাকুরের মা) কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। জননীদেবী সন্তমতের দ্বিতীয় গুরু হুজুর মহারাজের শিষ্যা ছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুরেশদা মহারাজ সাহেবের সময়ে দীক্ষা নিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোভাবের পরে সুরেশদা আবার জীবন্ত গুরুর অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ভাগ্যক্রমে এই সময়েই ইন্দুহরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। সুরেশদা তখন ইন্দুদার নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হন। সংবাদ জানার সাথে সাথে তিনি হিমাইতপুর চলিয়া আসেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে অসাধারণ মহান্ পুরুষ দর্শনমাত্র সুরেশদা এবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। এই সাক্ষাৎ হওয়ার কিছুকাল পরেই সুরেশদা হিমাইতপুর আশ্রমে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। সুরেশদা সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ এই পুস্তকের অপর খণ্ডে আছে। পূর্ব্ব হইতেই আশুতোষের প্রতি সুরেশদার স্বাভাবিক অনুরক্তি ছিল। সেই কারণেই তিনি পত্রাদি আদান-প্রদান দ্বারা আশুতোষকে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে জানাইয়াছিলেন। এই সূত্রেই আশুতোষ জননী মনোমোহিনী ও শ্রীশ্রীঠাকুর বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন।

এখন ইন্দুহরণ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। তাহার বাড়ী ঢাকা জেলার অন্তর্গত গাওদিয়া। আমাদের বাড়ী হইতে ন্যূনাধিক তিন মাইল ব্যবধান। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাহার ভাগিনেয় নরেন্দ্র আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া স্কুলে পড়িত। একদিন কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া আমার নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর ও হিমাইতপুর আশ্রমের নাম শুনিয়াই নরেন্দ্র প্রকাশ করিল—তাহার মাতুল সৎসঙ্গী, এখন তিনি ছুটি নিয়া বাড়ীতে আছেন। এই সংবাদ জানার কয়েকদিন পরেই আমি গাওদিয়া গিয়া ইন্দুদার সহিত দেখা করি। সৎসঙ্গের সহিত আমার যোগাযোগ হওয়ায় পাঁচ কি ছয়মাস পরেই ইন্দুদার সহিত আমার এই সাক্ষাৎকার। সন্তমতের

দ্বিতীয় গুরু হুজুর মহারাজ সাহেবের সময়ে ইন্দুদা দীক্ষা নিয়াছিলেন। হুজুর মহারাজের তিরোভাবের পরে ইন্দুদা তৃতীয় গুরু মহারাজ সাহেবের আশ্রয় নেন। তাঁহার তিরোভাবের পরে চতুর্থ সন্তসদ্‌গুরু সরকার সাহেবের আশ্রয় নিয়া সাধনায় রত থাকেন। সরকার সাহেবের অন্তর্ধান হইলে পরে শ্রীশ্রীঠাকুরই বর্ত্তমানে ওয়াক্ত অর্থাৎ জীবন্ত সদ্‌গুরু জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন। আমাদের সঙ্ঘভ্রাতা শ্রদ্ধেয় বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের জ্ঞাতি-ভাই কুলদাকান্ত ভট্টাচার্য্য আগ্রা-সৎসঙ্গের সাহেবজী মহারাজের সময়ে এই প্রণালীতে দীক্ষা নিয়াছিলেন। কুলদাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আগেই জ্ঞাত ছিলেন। ঘটনাচক্রে কুলদাদার সহিত ইন্দুদার সাক্ষাৎ ঘটে। তার পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন উদ্দেশ্যে ইন্দুদা ও কুলদাদা একযোগে হিমাইতপুর আশ্রমে চলিয়া আসেন। তৎসময়েই ইন্দুদা পাবনা সৎসঙ্গের সহিত যুক্ত হয়। হিন্দি সারবচন, প্রেমবাণী ইত্যাদি সন্তমতের সাধন প্রণালীর যাবতীয় পুস্তক ইন্দুদার আগাগোড়াপড়াশোনা ছিল। তাই পূর্ব্বাপুর্ব্ব সন্ত সদ্‌গুরুদিগের সম্পর্কে তাহার সবিশেষ জানা ছিল। যাজন উপলক্ষে আমি ও ইন্দুদা বহুক্ষেত্রে একযোগে কাজ করিয়াছি। তজ্জন্য আমাদের সর্ব্বক্ষণ মেলামেশা ও একসঙ্গে থাকার যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। অবকাশ মতে ইন্দুদা সচরাচর আমাদের বাড়ীতে আসিতেন আমিও সেইভাবে তাহার বাড়ীতে গিয়া থাকিতাম। ইন্দুদা অতিশয় আলাপ-প্রিয় প্রেমিক সৎসঙ্গী ছিলেন। যখন যেখানে উপস্থিত থাকিতেন সেখানেই আসর জমিত। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ভাগীনেয় আশুতোষের সহিত সাক্ষাৎ করা সম্পর্কে আগে যাহা বলিতে ছিলাম—সেইদিন তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে অনেক কথাই হইল কিন্তু নিজে যে দীক্ষা নিয়াছি এ কথা আর প্রকাশ করিলাম না।—ইচ্ছাপুর্ব্বকই চাপিয়া গেলাম। আশুতোষের কাছে কেন গিয়াছিলাম তাহা এখন খুলিয়া বলিতেছি। হিমাইতপুর আশ্রমে আলাপ-আলোচনার মধ্যে একদিন

শ্রীশ্রীঠাকুর "Discourse on Radha Swami Faith" নামক পুস্তকখানা ভাল করিয়া পাঠ করিবার কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। তাই বিদায়কালে সেই বইখানা তাঁহার নিকট চাহিলাম। পুস্তক ছিল না বলিয়া তিনি দিতে পারিলেন না। অতঃপর আমি বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। আমার দীক্ষা বিষয়ে ভাগিনেয় আশুতোষ যে তখনই ধরিতে পারিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারিলাম। প্রতি বৎসরই ৺নবমী পূজার দিন তাঁহার বাড়ীতে মহারাজ সাহেবের ভাণ্ডারা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে তথায় বহু সৎসঙ্গী আসিয়া যোগদান করিয়া থাকেন। আত্মীয়তা নিবন্ধন তদুপলক্ষে আমাদেরও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ বৎসর ভাণ্ডারা উপলক্ষে আমি সস্ত্রীক যাহাতে উপস্থিত থাকি তজ্জন্য আশুতোষ লোক পাঠাইয়া আগেই নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিলেন। অধিকন্তু পত্রেও ভিন্নভাবে উপস্থিত থাকার বিশেষ অনুরোধ ছিল। ভাণ্ডারার দিন ভোজনের সময়ে ভাগিনেয় আশুতোষ নিজেই আমাকে ডাকিয়া সাথে নিলেন এবং তাঁহার আহারের ব্যবস্থা যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে হইয়া থাকে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া দেখিলাম—আমাদের উভয়ের আহারের ব্যবস্থা একই স্থানে হইয়াছে। পূর্ব্বেও ভাণ্ডারা উপলক্ষে কতবার গিয়াছি, কিন্তু এই প্রকার আপ্যায়ন আর কোন দিন দেখি নাই। আহারে বসিয়া তিনি প্রকাশ করিলেন—আমি যে দীক্ষা নিয়া আসিয়াছি, ইহা আমার কথাবার্ত্তা হইতেই সেইদিন টের পাইয়াছিলেন। আশুতোষ বিংশতি বৎসরের উর্দ্ধকাল খাউটীয়া সৎসঙ্গের পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিগত ১৩৪১ সনের বৈশাখ মাসে তিনি নিজ বাড়ীতে দেহরক্ষা করেন।

এখন আমার যাজন আরম্ভ করা সম্বন্ধে বলিতেছি—প্রথম অবস্থায় স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে যাজন আরম্ভ করিলাম। সেই প্রচেষ্টার ফলে স্ব-গ্রামবাসী তিনটী যুবক ও পার্শ্ববর্ত্তী সানিহাটী গ্রামের এক প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা "নাম" গ্রহণ করিলেন। ইনিই সরলাবালা সরকার—স্বনামধন্য দেশসেবক বিনয়কুমার সরকারের আপন পিতৃব্য-পত্নী। "নাম" গ্রহণের সাত আট মাস

পরেই সরকার-মা আর আমার স্ত্রী একসঙ্গে কুষ্টিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করেন। মনে আছে ১৩২৮ সনের জ্যেষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগেই উঁহারা গিয়াছিলেন। আমিও উঁহাদের সাথে ছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের বায়ু ও স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য কার্সিয়ানী যাওয়ার সপ্তাহপুর্ব্বে কুষ্টিয়ায় এই তাঁহাদের দর্শন। এই সময়েও তিনি অশ্বিনীদার বাড়ীতে ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘোরতর অসুখের সংবাদ শুনিয়াই আমরা ঐ সময়ে কুষ্টিয়া গিয়াছিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কার্সিয়ানী যাত্রা করেন। ইহার দুই তিন দিন পুর্ব্বে আমরা কুষ্টিয়া হইতে বাড়ীতে চলিয়া আসি। শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করার পর হইতেই সরকার-মা উদ্দীপিত হইয়া উঠেন। সরকারমার যাজন হইতেই অমূল্য ঘোষের মা (আশ্রমে পরিচিত শান্তির মা) আমার বিষয় অবগত হন এবং সেই সূত্রেই তাহার দীক্ষা নেওয়া। আমি ১৩২৮ সনের কার্ত্তিক মাসে ৺লক্ষ্মী পুজার দিন প্রয়োজনবশতঃ কোরহাটী গ্রামে তারকচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ঘোষ মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে সেই রাত্রিতে তথায় থাকিতে হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে আলোচনা শুনিয়া তারকবাবু "নাম" নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই রাত্রিতে ওখানে থাকা। পরদিন গুরুত্যাগ, মন্ত্রত্যাগ ইত্যাদি অজুহাত দেখাইয়া তিনি আর "নাম" নিলেন না। আমি চলিয়া আসিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময়ে অমূল্যের মা আসিয়া "নাম" নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এইসঙ্গে তিনি ইহাও জানাইলেন—টাকা পয়সা খরচ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় দীক্ষা নেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়, সেই কারণেই বংশগুরু হইতে এতদিন দীক্ষা নিতে পারেন নাই। শুনিয়াছেন, এই "নাম" নিতে টাকা-পয়সা লাগে না, সেই ভরসায় তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। এখন "নাম" পাইলেই কৃতার্থ হইবেন। অতিশয় আগ্রহান্বিতা দেখিয়া আমি উক্ত মাকে আশা ভরসা দিয়া বলিলাম—আপনার কিছুই দিতে হবে না, চাই আন্তরিকতা। অতঃপর তাহাকে "নাম" দেওয়া হইল। যে সময়ের এই ঘটনা, তৎকালে প্রণামী বা দক্ষিণা নেওয়ার কোন আদেশ ছিল না;

দীক্ষা গ্রহণের তিন চারি বৎসর পরেই উক্ত মা, পুত্র অমূল্য—সে তখন নাবালক, আর নাবালিকা কন্যা শান্তিকে নিয়া আমার সাথে আশ্রমে চলিয়া আসে। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত এই পরিবার শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যেই বসবাস করিতেছে।

শান্তির মা আশ্রমে চলিয়া আসার তিন কি চারি বৎসর পরের কথা একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিলেন সত্য-নারায়ণের সিন্নি কি কি উপকরণ দ্বারা কি প্রণালীতে নিবেদন হইয়া থাকে। ইহার পরেই উক্ত মাসের শেষ শুক্রবার শান্তির মার ঘরে সিন্নির ব্যবস্থা হইয়াছিল। * শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং তাহার গৃহে গিয়া সিন্নি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ শুক্রবার শান্তির মার ঘরে সিন্নি হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে সিন্নির সমস্ত উপকরণ অগ্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্যে ঠাকুর বাড়ী পাঠান হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর গ্রহণের পরে ঐ প্রসাদ তাহার ঘরে আনিয়া পশ্চাতে পাড়াপড়শীদের মধ্যে বিতরণ হইয়া থাকে।

যাজন সম্পর্কে আগে যাহা বলিতে ছিলাম—তা' ১৩২৭ সনের ফাল্গুন মাসের কথা—আমার পিতৃব্য মহাশয় দীর্ঘদিন ধরিয়া অসুখে ভুগিতে ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তিম সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার একান্ত আগ্রহে তাঁহাকেও "নাম" দেওয়া হয়। "নাম" পাওয়ার পাঁচ ছয় দিন পরেই তাহার দেহান্তর। আগে গুরুত্যাগ, মন্ত্রত্যাগ নানা প্রকার দ্বিধা থাকায় "নাম" নিতে রাজী ছিলেন না। এইস্থলে এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য সময় হারাইয়াই তিনি "নাম" পাইয়াছিলেন, তথাপি এই তৃপ্তি-শেষ মুহূর্ত্তে যে এই শুভবুদ্ধি হইয়াছিল। এইপ্রকার ধান্ধায় পড়িয়া কত লোক যে জীবনে কত সুযোগ হারাইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমার জননীদেবীও গতানুগতিক কৌলিক প্রথামতে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় শুনিয়া ক্রমে ক্রমে এই "নাম" নেওয়ার জন্য

---

* শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম শুক্রবার তাই ঐ বার সমস্ত সৎসঙ্গীদের নিকট বিশেষ প্রশস্ত।

ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তখন মা আমার অতিশয় বৃদ্ধা, উভয় চক্ষুতে ছানি জন্মিয়াছিল, তাই একেবারে দৃষ্টিহীন, অধিকন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ চলাচল-রহিত। এই অবস্থায় আশ্রমে গিয়া যে "নাম" নিবেন কিম্বা শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিবেন সে ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। তাই উপায়ান্তর না দেখিয়া পত্রদ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বিস্তারিত জানান হয়। আশ্রম হইতে আমার উপরই "নাম" দেওয়ার আদেশ আসে। তদনুসারে মাকে "নাম" জানাইয়া দেওয়া হইল। প্রতিবেশীগণ এই রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। তখন কেহ কেহ এই প্রকার রটনাও করিল—ত্রৈলোক্য তাহার মায়ের গুরু হইয়াছে। অনভিজ্ঞতার দরুন মানুষ কত সময়ে কত যে মিথ্যা ব্যঞ্জনা করিয়া থাকে—ইহাও তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

বার্দ্ধক্য ও দৃষ্টিহীনতা ইত্যাদি কারণে মার ভাগ্যে সশরীরে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। অধিকন্তু, দৃষ্টিহীনতাবশতঃ ফটোর সাহায্যে যে ধ্যান করিবেন এই উপায়ান্তর ছিল না। তাই তিনি মনে মনে অনবরত "নাম" আর ইষ্ট উদ্দেশ্যে চিন্তা করিতেন। মাতৃদেবী ১৩২৯ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর ন্যূনাধিক দুই মাস পূর্ব্বে মলাবরোধবশতঃ পেটে তীব্র বেদনা হইয়াছিল। নানাপ্রকার চিকিৎসা সত্বেও কোন প্রকার প্রতিকার হইল না। ক্রমেই শরীর শীর্ণ হইতে থাকিল। অন্নাহার পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ ছিল। পথ্যের মধ্যে ছিল পাতলা সরবৎ, ডাবের জল, পাতলা বার্লি মাত্র। মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বে মা একদিন খিচুরি ও পায়েস খাওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেন। তখনই আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া সাব্যস্ত হইল আগামী দিন উহা তাহাকে দেওয়া হইবে। তদনুসারে ঐ সব খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইল। ঘটনাচক্রে সেইদিন ইন্দুহরণদা (মুখার্জ্জি) আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সহিতও পরামর্শ ক্রমে স্থির হইল—আগে বিনতি—প্রার্থনা করিয়া ঠাকুরভোগ, তৎপরে ঐ প্রসাদই মাকে

দেওয়া হইবে। পরিকল্পনা অনুসারে বিনতি—প্রার্থনা ও ভোগারতি সমস্তই আগে হইয়া গেল। ইত্যবসরে আমার ভগ্নীদেবী মায়ের গাত্রাদি স্পঞ্জ করিয়া মাথা ধোয়া ইত্যাদি কার্য্য সারিয়া নিলেন। জননীদেবীর উঠিয়া বসিবার শক্তি ছিল না, তাই শায়িত অবস্থাই ঐ সমস্ত করিতে হইল। ইহার কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল—মা গাঢ়নিদ্রাভিভূত, নাসিকা-গর্জ্জন সহ ঘন ঘন শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে। ইন্দুদা ও আমি উভয়ে নিকটে দাঁড়াইয়া অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিলাম। এদিকে আমার ভগ্নী প্রসাদ লইয়া ওখানে উপস্থিত হইলেন। এই অবস্থায় মাকে যেন ডাকা না হয় তজ্জন্য তাহাকে সতর্ক করা হইল। প্রায় দশ মিনিট কাল পরে মা চক্ষু উন্মীলন করিলেন। দিদি মাকে প্রসাদ গ্রহণ করার কথা বলিলেন। তখন মা বলিতে থাকিলেন—"আমার উদর পরিপূর্ণ খাব না, এইত শ্রীশ্রীঠাকুর এসেছিলেন,—দিব্যকান্তি, যুবাপুরুষ, আমাকে তিনি নিজ হাতে কত ফলফলাদি, পায়েস, মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া এই মাত্র চলিয়া গেলেন।" এই বিবৃতি শুনিয়া আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। অতঃপর দিদির একান্ত অনুরোধে অঙ্গুলিপৃক্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ মা গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনার সপ্তাহকাল পরেই মাতৃদেবীর পরলোক গমন। অতৎপর যে কয়দিন তিনি জীবিত ছিলেন কেবল শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদোদক পান করিতেন।

এইখানেই যাজনপথের প্রথম পর্ব্বের পরিসমাপ্তি। এখন উহার দ্বিতীয় পর্ব্বের অবতরণিকা আরম্ভ করা গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

বাংলাদেশে সৎসঙ্গের প্রচার ও কার্যবিস্তার—

ঢাকা জেলা—

ঢাকা সদর, শুভড্যা, পশ্চিমদি, মুন্সিগঞ্জ সদর, তদধীন পঞ্চসার, সেওভোগ, পাইকপাড়া, মালখানগর, মধ্যপাড়া, বেতকা, রায়পুরা, টঙ্গিবাড়ী, বেলুয়া, মারিয়াইল, ধামারণ, বড়লিয়া, সুয়াপাড়া, পূর্ব্ব-শিমুলিয়া, শ্রীনগর, ষোলঘর, হাসারা, রাজানগর, বাড়ইখালি, পাটাভোগ, লৌহজঙ্গ, দীঘলি, পাইকারা, ব্রাহ্মণগাঁ, সানিহাটি, তেউটিয়া, কোরহাটী, মাইজপাড়া, বাড়িখাল, কাজিরপাগলা, কোলাপাড়া, জগন্নাথপট্টি, ভাগ্যকুল, দামলা, নারিসা, নারায়ণগঞ্জ সদর, বন্দর, মীরকুণ্ডী, লক্ষ্মীনারায়ণ-কটন মিলস্, চিত্তরঞ্জন-কটন-মিলস্, ঢাকেশ্বরী-কটন-মিলস্, মুরাপাড়া, গোলাকান্দাইল, বরুণা, কাঞ্চন, কালিগঞ্জ, বক্তারপুর, ভাওয়াল-ব্রাহ্মণগাঁ, জয়দেবপুর, ঘোষগাঁও, মির্জ্জাপুর, আমৃতপুর, শেখরগ্রাম, মনোহরদি, একদুয়ারীয়া, শ্রীনিধি, রায়পুরা, নরসিংহদি, আমিরাবাদ, মানিকগঞ্জ সদর, মহাদেবপুর, বেতিলা প্রভৃতি স্থানে এক সময়ে একাদিক্রমে যাজনকার্য্য প্রবল ভাবে চলিয়াছিল। বলিতে গেলে সেইযাত্রা ১৩২৭-২৮ সন পর্য্যন্ত দুইবৎসরের অধিক সময় ব্যয়িত হইয়াছিল ঢাকা জেলার যাজন কার্য্যে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে দেশসেবক বিনয়কুমার সরকারের খুড়ীমা সরলাবালা সরকার এই "নাম" গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাজন করাই এই মার প্রকৃতি ছিল; সুযোগ পাইলে উক্ত মা আমাকে নিয়া আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যাইতেন। এই উদ্দেশ্যে হইতেই সরকার-মা আমাকে নিয়া ১৩২৭ সনের অগ্রহায়ণ মাসে তাহার পিত্রালয় বেতকা গ্রামে গিয়াছিলেন।

তথায় কয়েকদিন থাকার দরুণ বেতকা, রায়পুরা, পাইকপাড়া ও আউটসহি এই কয় গ্রামে যাজন করার সুযোগ হইল। ঐ সময়েই একদিন রায়পুরা খেলারমাঠে আমার বক্তৃতা হইতেছিল; তখন মণীন্দ্রমোহন দাস বি এ বি টি (পরবর্ত্তীকালে ঝালকাটি সরকারী হাইস্কুলের হেডমাষ্টার) ও ডাঃ রজনীকান্ত বসু মালখানগর হইতে বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে বক্তৃতা, তাই শুনিবার সুযোগ নিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পরে উভয়েই আগামী দিন আমাকে তাহাদের বাড়ীতে যাওয়ার অনুরোধ করিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রত্যুষে মণীন্দ্রদা' নিজেই বেতকা আসিয়া আমাকে তাহার বাড়ীতে নিয়া গেলেন। মণীন্দ্রদার বাড়ী পাইকপাড়া। ঐ গ্রাম বেতকার সংলগ্ন। বাড়ীতে গিয়াও তাহার সঙ্গে অনেক প্রশ্নোত্তর হইল। অতঃপর মণীন্দ্রদা এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—মন্ত্র নিতে যখন খরচা নাই, অথচ দৃঢ়প্রত্যয়সহকারে বলিতেছেন "নাম" করিলে ফল সুনিশ্চিত, তদবস্থায় কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না; নাম নিলেই ফলাফল বোঝা যাইবে"। সেই দিনই মণীন্দ্রদা ও তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূ—তিনি বিধবা, উভয়ে "নাম" গ্রহণ করিলেন। মণীন্দ্রদার স্ত্রী পিত্রালয়ে ছিলেন বলিয়া তাহার দীক্ষা পরে হইয়াছিল। মণীন্দ্রদার অনুরোধে পাইকপাড়া আরও কয়েকদিন থাকিতে হইল। এই সুযোগে গ্রামবাসী আরও অনেকের নিকট যাজন করিতে পারিলাম। তাহার ফলে ঐ গ্রামে আরও কেহ কেহ নাম গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে সরকার মার প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বেতকা ভদ্রদের বাড়ীর কয়েকজন আর গুহদের বাড়ীর কেহ কেহ "নাম" নিলেন। উহাদের মধ্যে বেতকার নিবারণচন্দ্র মজুমদারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের মধ্যে তিনি প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। অধিকন্তু সাহিত্যিক বলিয়া তাহার খ্যাতিও ছিল। বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একখানা পুস্তকও তিনি লিখিয়াছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের কতকদিন পরে তিনি হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়াছিলেন। বেতকা যাজন করার সময়েই সরকারমার

জ্যেষ্ঠাভগ্নীর পুত্র নিশানাথ বসুরায়চৌধুরীর স্ত্রী "নাম" নিয়াছিল। নিশাদা পূর্ব্বেই আশ্রম হইতে "নাম" নিয়াছিলেন। তিনি একজন উত্তম সাধক ছিলেন। হিমাইতপুর আশ্রমেই তাহার দেহত্যাগ হয়। ইনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামের বিখ্যাত বসুরায়চৌধুরী বংশের সন্তান।

দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে মণীন্দ্রদা ছুটি উপলক্ষে অধিকাংশ সময় কখন সস্ত্রীক, কখন বা একক আশ্রমে আসিয়া থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করার পর হইতেই আনন্দবাজারের সাহায্যস্বরূপ তিনি প্রতি মাসে পাঁচ টাকা জননীদেবীর নামে পাঠাইতেন। মণীন্দ্রদা জীবিত থাকা পর্যন্ত ঐ টাকা নিয়মিত ভাবে দিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি যখন যেখানে চাকুরী উপলক্ষে থাকিতেন তথা হইতেই পত্র লিখিয়া বৎসরে একবার আমাকে তাহার বাসায় নিতেন আর চলিয়া আসার সময়ে পরিধেয় বস্ত্র একখানা, তৎসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যথাসাধ্য প্রণামী ও পথের খরচা দিতেন—এই ছিল তাহার স্বতঃস্বেচ্ছ অবদান দীক্ষাদাতা আচার্য্যের প্রতি।

প্রথমযাত্রা ব্রহ্মদেশে গমন উপলক্ষে চট্টগ্রাম হইয়া গিয়াছিলাম। তৎসময়ে মণীন্দ্রদা চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী-প্রধানশিক্ষক। ঐ সময়েই তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীন্দ্রমোহন দাসের সহিত আমার পরিচয়। তিনি ইঞ্জিনিয়ার। কনট্রাক্টরী তখন তাহার স্বাধীন ব্যবসায়। বিল্ডিং নির্ম্মান, সিমেন্ট কনষ্ট্রাকসন ইত্যাদি সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতার কথা অনেক শুনিলাম। তখন তাহার কর্ম্মক্ষেত্র আকিয়াব। এই সাক্ষাতের প্রায় দশ বৎসর পরে তিনি চট্টগ্রাম টাউনে আমার নিকট সস্ত্রীক দীক্ষা নেন। তখন তিনি আকিয়াব হইতে চট্টগ্রাম চলিয়া আসিয়াছিলেন। সৎসঙ্গ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের গৃহ-নির্ম্মান কার্য্যে যে সময় তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখনো তাহার দীক্ষা হয় নাই। অগ্রজ মণীন্দ্রমোহন দাসের ইচ্ছা ক্রমেই তিনি তখন কেমিক্যাল ওয়ার্কসের গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্যে

ব্রতী হন। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি পূর্ব্বানুরাগ বা কোন টান না থাকিলে দীর্ঘদিন নিঃস্বার্থ ভাবে ঐ কার্য্যে নিজে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন না। ঐ অনুরাগও জন্মিয়াছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পর্কে আমাদের নিকট বার বার শোনা হইতে। চট্টগ্রাম টাউনে তাহার নিজস্ব একখানা বাসাবাড়ী ছিল। "নাম" নেওয়ার পর হইতেই উক্ত বাসার একখানা কামরা সৎসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশনের জন্য যতীনদা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বহুকাল ঐ গৃহে সৎসঙ্গের অধিবেশন চলিয়াছিল। পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার কিছুদিন পরেই এই অধিবেশন কেন্দ্র বন্ধ হইয়া যায়। সহ-প্রতিঋত্বিক ক্ষিতীশচন্দ্র রায়দাস ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার আলিপুর, উঁহারই আপন খুল্লতাত ভ্রাতা। ইহারা যে সদ্বংশজ আচরণেই পাওয়া যায়। উচ্চের প্রতি সহজানতি—ইহাদের চরিত্রগত লক্ষণ। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী—উচ্চে যারা সহজানত, তারাই শ্রেষ্ঠ বংশজাত।"—এই কথার যাথার্থ্য ইহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

জগন্নাথপট্টী—

ঐ গ্রামে ১৩২৮ সনে বৈশাখ মাসের প্রথমভাগ দিয়া গিয়াছিলাম। ওখান হইতে ভাগ্যকুলেও যাজনে যাওয়া হইয়াছিল। বেলেঘাটার পুরাতন সৎসঙ্গী শশীমোহন সাহার আগ্রহেই সর্ব্ব প্রথম জগন্নাথপট্টি যাওয়া হয়। জগন্নাথপট্টি তাহার পৈত্রিক বাসস্থান, আর বেলেঘাটা তাহাদের কারবার স্থল। তিনি ইষ্টানুরাগীভক্ত ও যাজনশীল ছিলেন। ইহা তিনি ভালভাবেই বুঝিয়াছিলেন, পরিবারস্থ সকলে ও প্রতিবেশীগণ এই পথে আসিলে যে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ সুদৃঢ় হইবে এবং তৎসঙ্গে সৎসঙ্গও স্বতঃ দানা বাধিয়া উঠিবে। তাহারই প্রচেষ্টায় ঐ অঞ্চলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারার প্রথম বিস্তার। তাহার পরিবার মধ্যে নিজের স্ত্রী, ছেলেরা কয়েকজন, কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা, ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের স্ত্রী আর প্রতিবেশী কতিপয় ব্যক্তি তৎসময়ে আমার নিকট হইতে "নাম" গ্রহণ করে। সেই

সময়েই শশীদার বাড়ীতে প্রতি রবিবারের সৎসঙ্গ অধিবেশনের উদ্বোধন। আগাগোড়া নিয়মিত ভাবে ঐ অধিবেশন চলিয়াছিল। পাকিস্থান সৃষ্টি হওয়ার পরে নানাজন নানাস্থানে চলিয়া যাওয়ায় তথায় আর এখন সৎসঙ্গ হয় না। কিন্তু উক্ত শুভ অনুষ্ঠান অদ্যাপিও চলিয়াছে। শশীদার পরিবারস্থ সকলে জগন্নাথপট্টির বাড়ী ছাড়িয়া বর্ত্তমান কলিকাতা কলীংষ্ট্রীটের বাড়ীতে বসবাস করিতেছে। ওখানেও এখন যথারীতি সৎসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া থাকে। অধিকন্তু শশীদা জীবদ্দশায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে নিজ বাড়ীতে কীর্ত্তনসহ ভোগারতি দ্বারা যে বার্ষিক উৎসবের প্রচলন করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও সেই অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে প্রতিবৎসর কলিকাতার বাড়ীতে হইয়া থাকে। তাহার সন্তানসন্ততি ও পুত্রবধূ সকলেই এই সৎনামে দীক্ষিত। এমন সুন্দর সুনিয়ন্ত্রিত পরিবার কদাচিৎ দেখা যায়। বহুকাল পূর্ব্বেই শশীদা ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু পিতৃ-অনুরাগী তাহার সন্তানদিগের মধ্যদিয়া এখনও সেই সাড়া পাওয়া যাইতেছে।

পরবর্ত্তী সময়ে জগন্নাথপট্টিতে আরও অনেকে "নাম" গ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে ডাঃ গৌরবিনোদ সাহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৎসঙ্গী খগেন্দ্রনাথ সাহার যাজনেই প্রথমে গৌরবিনোদ সাহা সস্ত্রীক, তৎপর তাহার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা শ্যামলাল ও জগবন্ধু সস্ত্রীক দীক্ষা নেয়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশী আরও অনেকে "নাম" গ্রহণ করিয়াছিল। দীক্ষার পর হইতে ডাঃ গৌরবিনোদ সাহার বাড়ীতেও সপ্তাহে একদিন সৎসঙ্গ অধিবেশন হইত। রবিবারে শশীদার বাড়ীতে আর শুক্রবার গৌরবিনোদার বাড়ীতে সৎসঙ্গ হইত।

বাহিরে যাজনে নিযুক্ত থাকাকালে ১৩৪৭ সনের আষাঢ় মাসে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মাঝিনা গ্রামের গুহমজুমদারদের বাড়ীতে আমি অকস্মাৎ জরাক্রান্ত হই। লক্ষণে বুঝিতে পারিলাম জ্বর টাইফয়েডে পরিণত হইবে। তখন অনন্যোপায় হইয়া তথা হইতে জগন্নাথপট্টি ডাঃ গৌরবিনোদ সাহার

বাড়ীতে চলিয়া আসিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় প্রতিক্রিয়ার ফলে তৎকালে ঔষধপত্র ইন্‌জেকসন সবই দুষ্প্রাপ্য, মিলিলেও অতিশয় দুর্ম্মূল্য; তাই একজন সৎসঙ্গী ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকা ভাল মনে করিয়াই ওখানে আসা হইল। ঐ অসুখের সময় ডাঃ গৌরদা ও ঐ বউমা (তাহার স্ত্রী), কম্পাউণ্ডার কৃষ্ণমোহন সেন—বর্ত্তমানে দেওঘর সৎসঙ্গ মেডিক্যাল এইডে আছে, আমার যেরূপ যত্ন নিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গৌরদা নিজের বিশেষ তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা পরিচালনা করিতেন, কম্পাউণ্ডার কৃষ্ণদা যত্নের সহিত ঔষধাদি সেবন করাইতেন, আর গৌরদার স্ত্রী স্বহস্তে মলমূত্রাদি অপসারণ অবধি প্রয়োজনমত মাথায় জলধারা দেওয়া, গাত্রাদি স্পঞ্জ করা ইত্যাদি যাবতীয় শুশ্রূষা নিজে করিতেন। ঐসময়ে বউমার কোলে একটী শিশুসন্তান থাকা সত্ত্বেও তিনি এতখানি দায়িত্ব নিজের উপর নিয়াছিলেন। ঔষধপত্র হইতে মত্র ফলফলাদি-দুগ্ধ-পথ্যাদির যাবতীয় খরচা গৌরদাই নিজে বহন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের এই প্রকার ভীষণ সঙ্কট কালে এই ভাবে কঠিন রোগগ্রস্ত অবস্থায় অন্ত কোথাও থাকিলে হয়তো শুশ্রূষার অভাব হইত না, কিন্তু এমন সহজসাধ্য চিকিৎসা এবং দুষ্প্রাপ্য ঔষধাদি পাওয়া কঠিন হইত—ইহা নিশ্চিত। গৌরদা ও তাহার স্ত্রীর এই প্রকার সেবা কখনো ভুলিবার নহে। আরোগ্যলাভের পরেই আমি হিমাইতপুর আশ্রমে চলিয়া আসিলাম।

ঢাকা টাউন—

ঢাকা টাউনে ১৩২৮ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ দিয়া সর্ব্ব প্রথম যাজনে ব্রতী হই। সঙ্ঘভ্রাতা ডাঃ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের টিকাটুলিস্থিত নিজস্ব বাসাবাড়ীতে গিয়া প্রথম উঠিলাম। ইন্দুহরণ মুখোপাধ্যায়ের সাথে গিয়াছিলাম। অমৃতদা আগে আগ্রা-সৎসঙ্গের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে মহারাজ সাহেবকে, তাঁহার তিরোধানের পরে সরকার সাহেবকে জীবন্ত সদ্‌ গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকার সাহেবের তিরোধানের পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় নন। ইন্দুহরণদা হইতে অমৃতদা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়

জ্ঞাত হন। ইন্দুহরণদা যৎকালে লুসাই পাহাড়ে সরকারী চাকুরিতে ছিলেন, তৎসময়ে অমৃতদাও তথায় সরকারী হাসপাতালের পর্য্যবেক্ষক ডাক্তার। ওখানেই উভয়ের মধ্যে পরিচয় এবং একই সময়ে ওখানেই উঁহাদের এই মতে দীক্ষা গ্রহণ। এই কারণেই পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। ঢাকাতে যাজন করার ফলে অমৃতদার পরিবারের মধ্যে তাহার কয়েক ছেলে, জ্যেষ্ঠা কন্যা, জ্যেষ্ঠা কন্যার জামাতা ও কনিষ্ঠা কন্যার জামাতা আমার নিকট হইতে "নাম" গ্রহণ করে। অমৃতদা অতিশয় প্রেমিক সৎসঙ্গী ছিলেন। তিনি ১৩৪৯ সনের অগ্রহায়ণ মাসে পরলোক গমন করেন। এক সময়ে ঢাকা টাউনে অমৃতদার জ্যেষ্ঠ কন্যার জামাতা দীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায়ও সৎসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। দীনেশদাও ইষ্টপ্রাণ ছিলেন।

এই সময়ে সঙ্গভ্রাতা ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল, অডিটর সরকারী কার্য্যোপলক্ষে ঢাকাতে ছিলেন। উয়ারি রেঙ্কিন ষ্ট্রীটে তাহার বাসা ছিল। ক্ষিতীশদার স্ত্রী ও শাশুড়ী (কুমারখালিরমা) তৎকালে সেই বাসায় ছিলেন। কথাবার্ত্তার মধ্যদিয়া অমৃতদা হইতে জানিতে পারিলাম—ক্ষিতীশদা ও তাহার শাশুড়ী সকলেই সৎসঙ্গী। আর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হীরালালের সহিত উঁহাদের বিশেষ হৃদ্যতা। সৎসঙ্গী সুতরাং উঁহাদের সহিত আমারও পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন মনে করিয়া সেই দিনই অপরাহ্নে হীরালালের সহিত ক্ষিতীশদার বাসায় গেলাম। তাহার বাসায় থাকিয়া যাজনকার্য্য চালাইবার জন্য তখন তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর অমৃতদার সহিত পরামর্শ করিয়া দুই তিনদিন পরেই উয়ারি ঐ বাসায় চলিয়া আসিলাম। ওখানে থাকিয়া যাজনকার্য্য চালান নানাদিক দিয়া শ্রেয় মনে করিলাম। প্রথমতঃ টিকাটুলি হইতে মূল টাউন অনেক দূরে, যাজনান্তে অধিক রাত্রিতে টাউন হইতে টিকাটুলি ফিরিয়া আসিতে যথেষ্ট অসুবিধা, হয় ঝড় বৃষ্টি হইলে একাকী আসা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ কার্য্যকারণ সম্পর্কে ক্ষিতীশদার সহিত অফিসের অনেকের বাধ্যবাধকতা সুতরাং তাহার মারফৎ পরিচিত হইয়া ঐ

সমস্ত লোকের মধ্যে প্রবেশ অধিকতর সহজ—এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াই ঐ বাসাতে আসা হইল। অমৃতদাও এইদিক দিয়া আমার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিলেন। তখন ক্ষিতীশদার বাসা হইতেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকিল। তিনিও আফিসের লোকজনদের মধ্যে ঢাকাতে আমার উপস্থিতি ও উদ্দেশ্য কি রটনা করিয়া দিলেন। তাহার ফলে আফিস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কেহ তাহার সাথে, কেহ বা স্বকীয় ভাবে তাহার বাসায় উপস্থিত হইতেন; আর সেই সুযোগে তাহাদের সহিত আলোচনা হইত। ক্রমেই লোক বেশী আসিতে থাকিল; মাঝে মাঝে ঐ সমস্ত লোকদের নিয়া সৎসঙ্গ-অধিবেশন হইতে থাকিল। সৎসঙ্গ উপলক্ষে প্রসাদের ব্যবস্থাও বেশ ভালই হইত। ঐ সমস্ত ব্যয় ক্ষিতীশদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেই বহন করিতেন। কোন কোন সময়ে ইহাও দেখিয়াছি—গাড়ীভাড়া নাই এমন সৎসঙ্গীদের ভাড়াও তিনি দিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে কয়েকজন "নাম" গ্রহণ করিলেন। আবার তাহাদের যাজনে কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। এইভাবে যাজন প্রায় পূর্ণ দুই মাসকাল ক্রমাগত চলিয়াছিল। তৎপরে ক্ষিতীশদা ঢাকা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আমিও অন্য জেলায় কার্য্যারম্ভ করিলাম। ক্ষিতীশদার বাসায় যাজনকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে এক সময়ে আমি অতিশয় অসুস্থ হইয়া পড়ি। তৎকালে তদীয় শ্যালক উমাপদ বাগচীর স্ত্রী বুড়ীমা (সরোজবাসিনী দেবী) যেরূপ যত্ন সহকারে আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল তাহা ভুলিবার নহে। তখন বুড়ীমা নিতান্ত অল্পবয়স্কা। ক্ষিতীশদার স্ত্রী সুরমামা ও শাশুড়ী (কুমারখালিরমা) উভয়েই আমাকে অতিশয় প্রীতিপূর্ণ চক্ষে দেখিতেন। যাজন উপলক্ষে উঁহাদের সাথে যেখানেই রহিয়াছি, উঁহারা যে কত যত্ন, কত আপ্যায়ন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রথম যাত্রা প্রত্যাবর্ত্তনের পরে কয়েক মাস দেশে ছিলাম। সেই সময়ে কতকদিন আবার ঢাকা টাউনে সৎসঙ্গের ভাবধারা বিস্তারের জন্য ব্যাপৃত হইলাম। এই যাজন ১৩৩১ সনের আষাঢ় মাসে। এবারও ক্ষিতীশদার
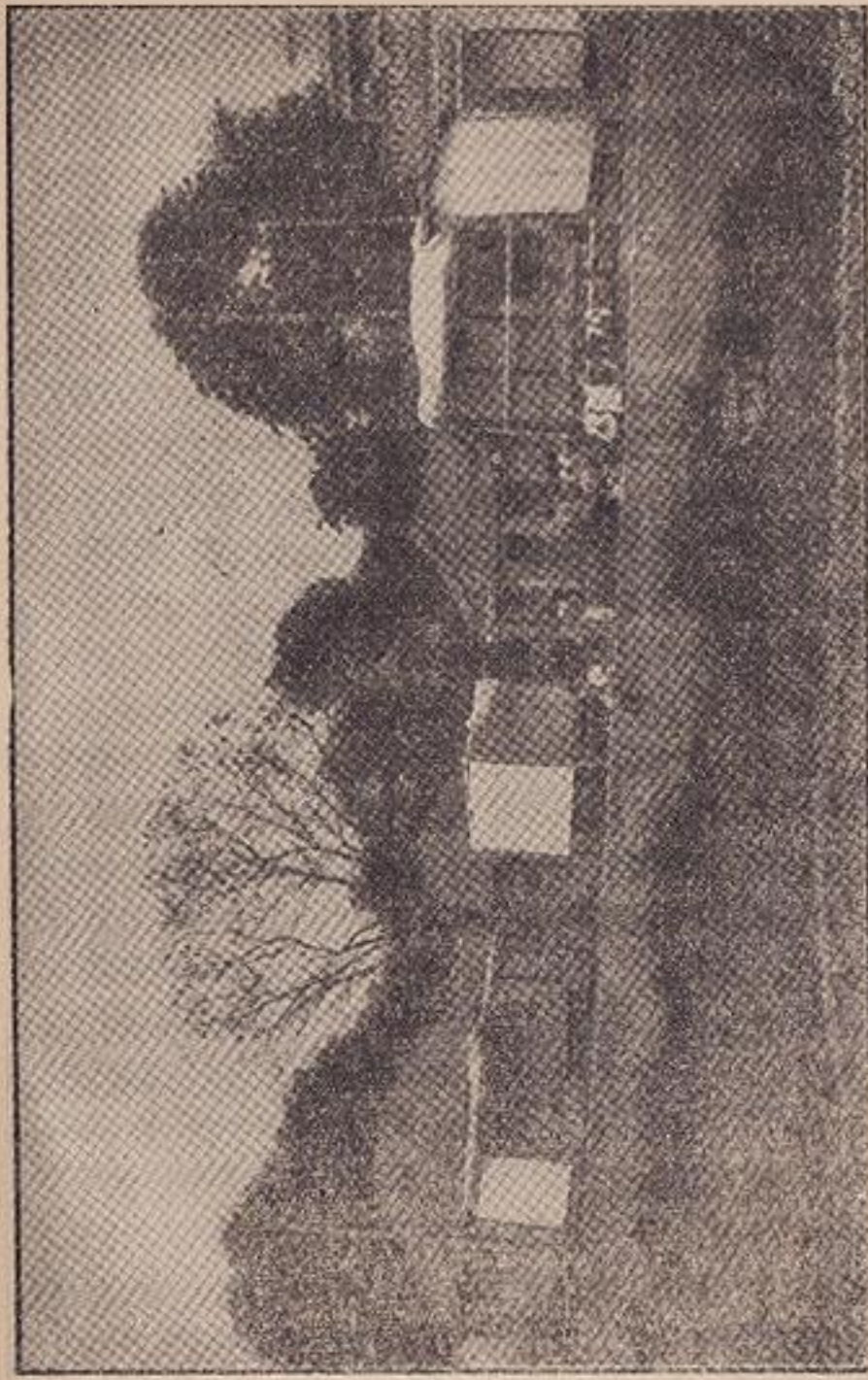
হিমাইতপুর আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাসভবনের সম্মুখের দৃশ্য

বাসা হইতে। সরকারী কার্য্য উপলক্ষেই তিনি পুনর্ব্বার ঢাকা আসিয়াছিলেন। ঐ সময়েও উয়ারি রেঙ্কিন ষ্ট্রীটেই বাসা ছিল, পূর্ব্বের বাসা নয়—উহারই অপর পার্শ্বে অন্য বাড়ী। এই সময়েও ক্ষিতীশদার স্ত্রী ও শাশুড়ী (কুমারখালিরমা) উভয়েই সঙ্গে ছিলেন। তাই আমার পক্ষে অনেক দিক দিয়া সুবিধা হইয়া গেল। এবারও যাজন পূর্ব্ববৎ জোরে চলিল। পূর্ব্বপরিচিত অনেক লোক তথায় পাওয়া গেল। পুরুষদের সাথে আমি ও ক্ষিতীশদা যাজন করিতাম, আর মেয়েদের নিয়া সুরমা-মা ও কুমারখালির-মা যাজন করিতেন। তৎসঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় সৎসঙ্গও চলিতে থাকিল।

ক্রমে ক্রমে বিশেষ বিশেষ স্থানে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল। ঢাকা-উকিল-বার, মোক্তার-বার, ইষ্টবেঙ্গল হাইস্কুল, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা-হল, লালমোহন সাহার ঠাকুরবাড়ী, ৺লক্ষ্মীনারায়ণজীর বাড়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানে একাদিক্রমে বক্তৃতা ও আলোচনা চলিল। ঢাকা-বারে বক্তৃতা হওয়ার পরেই প্রবীণ উকিল মহেন্দ্রলাল রায় আর প্যারীমোহন ঘোষ দীক্ষা গ্রহণ করেন। "নাম" গ্রহণের পর হইতেই আর্ম্মানিটোলা মহেন্দ্রলাল রায়ের বাসায়, আর লক্ষ্মীবাজার উকিল প্যারীমোহন ঘোষের বাসায় নিয়মিত ভাবে সৎসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইতে থাকিল। কয়েকমাস পরেই ক্ষিতীশদা ঢাকা হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তখন প্যারীদার একান্ত আগ্রহে তাহার বাসায় গিয়া রহিলাম। তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বিষয়ক প্রসঙ্গ নিয়াই প্যারীদার সহিত রাত্রিতে অধিক সময় অতিবাহিত হইত। প্যারীদা যদিও আমা অপেক্ষা অনেক বয়োধিক ছিলেন তথাপি তিনি অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত নিবিষ্টচিত্তে আমার কথাগুলি শুনিতেন। তাহার বাসাতেই দেশবন্ধুর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়। আমাদের এই সাক্ষাৎকার হইয়াছিল ১৩৩১ সনের ভাদ্র মাসে। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা হইতে বুঝিতে পারিলাম দলীয় কোন বিষয়-ব্যাপার মীমাংসার জন্যই দেশবন্ধুর ঢাকাতে ঐ আগমন। তিনি যে

সৎসঙ্গের দীক্ষা নিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত—এই সমস্ত বার্ত্তা আমি রেঙ্গুন থাকাকালেই পাইয়াছিলাম। তাই তাঁহাকে দেখিবার ঔৎসুক্য ছিল। প্যারীদার বাসায় দেশবন্ধুকে পাইয়া সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। এই সময়েই ঢাকা সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্রে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশবন্ধুদাকে আমন্ত্রণ করা হয়। সময় ছিল না বলিয়া তিনি তাহাতে যোগদান করিতে পারিলেন না। যোগদান যে করিতে পারিবেন না—এইজন্য খুবই ব্যথিত, এই ভাব এমন কোমলকণ্ঠে বিনয়ের সহিত তিনি ব্যক্ত করিলেন, তাহাতে আমরা মুগ্ধ হইয়া গেলাম। মহতের ব্যবহারের মধ্যে যে তাহার আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায়, এইস্থলে তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত দেশবন্ধুর প্রথম যোগাযোগ ও দীক্ষা ১৩৩১ সনের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে, ইং ১৯২৪ সন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। এই স্বল্পকালমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি কত গভীর তাৎপর্য্যের সহিত বোধ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায় মৃত্যুর পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং অবস্থানকালে মহাত্মাজীর সহিত দেশবন্ধুর যে সমস্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা হইতে। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের অব্যবহিত পরেই মহাত্মাজী—"At Darjeeling" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে "Young India" পত্রিকায় উহা প্রকাশ করেন।

I have learnt from my Guru (Spiritual Guide) the value of truth in all our dealings. I want you to live with him for a few days at least, Your need is not the same as mine, but he has given me strength, I did not possess before. I see things clearly which I saw dimly before.

YOUNG INDIA—July, 1925.

অর্থাৎ "আমাদের জীবনে সত্যের মর্য্যাদা কতটুকু তাহা আমি আমার গুরুদেবের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। আমি ইচ্ছা করি কিছুদিন আপনি

তাঁহার সঙ্গ করুন। আমার যাহা প্রয়োজন তাহা আপনার না হইতে পারে কিন্তু তিনি আমাকে এমন শক্তি দান করিয়াছেন যাহা পূর্ব্বে আমার ছিলনা। যে সকল জিনিষ আমি অস্পষ্ট দেখিতাম, এখন তাহা আমি স্পষ্ট দেখিতেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ লাভ করার পর হইতে দেশবন্ধুর জীবনের যে বিরাট পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল তাহা মহাত্মাজীও স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর নিজস্ব মন্তব্য হইতে সেই প্রমাণ পাওয়া যায়—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুল চন্দ্রের সঙ্গ লাভ করিবার পর দেশবন্ধুকে যেমন মিষ্টি লাগিয়াছে, এমন আর পূর্ব্বে দেখি নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে কি উচ্চ ধারণাই-না তার ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য দেশবন্ধুর যে অনুরোধ ছিল মহাত্মাজী তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্য হইতেই ইং ১৯২৫ সনের ২৭শে মে তারিখে তিনি হিমাইতপুর আশ্রমে আসেন। দেশবন্ধু তখন বর্ত্তমান। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত অনেক বিষয়ে মহাত্মাজীর কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। জননীদেবীর (শ্রীশ্রীঠাকুরের মা) সহিতও তিনি আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে মহাত্মাজী যে কত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব মন্তব্য হইতেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা গেল —"...I have never seen such a masterful woman in my life." (এমন মহিয়সী নারী জীবনে আমি কখনও দেখি নাই)। মহাত্মাজী যে সময়ে আশ্রমে আসিয়াছিলেন তৎকালে দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন (ভোম্বল) ও তাহার স্ত্রী সুজাতা-মা আশ্রমে ছিলেন।

পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম--এই সময়েই প্যারিদা দেশবন্ধুর নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে আরো সবিশেষ জ্ঞাত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়া আসেন। তৎপরে তিনি বেশী দিন জীবিত ছিলেন না।

উকিল মহেন্দ্রদাও অতিশয় হৃদয়বান্ তেজস্বী লোক ছিলেন। এক সময়ে ঢাকা-বারের একজন সাধারণ উকিলকে কোন উর্দ্ধতন বিচারক তাচ্ছিল্যের

সহিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। তদ্দরুণ ঐ উকিল অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বারের অন্যান্য উকিলদের নিকট নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন। তন্মুহূর্ত্তেই মহেন্দ্রদা অগ্রগামী হইয়া বিশিষ্ট উকিলদের সহিত পরামর্শ করিয়া তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেন। শেষকালে সেই বিচারকের এইজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল।

ঢাকাতে এইবার যাজন উপলক্ষে জগন্নাথ কলেজেও আমার বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বক্ষণে উকিল মহেন্দ্রদা প্রিন্সিপাল সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্রের সহিত আমাকে পরিচিত করাইলেন। সভাস্থলেও তিনি আমার পরিচয় দিলেন, আর এইরূপ আবেগের সহিত করিলেন তাহা অনেকেরই মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। মুক্তাগাছা-হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেওয়ানবাহাদুর সারদাপ্রসাদ সেন অবসর প্রাপ্ত সেসন জজ সভাপতি ছিলেন। বক্তৃতা শেষ হইলে পরে সারদা বাবু আমাকে তাঁহার বাসায় যাওয়ার অনুরোধ জানাইলেন। তদনুসারে পর দিন প্রাতে আমি তাঁহার বাসায় গিয়াছিলাম। কয়েকটি প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ার পরেই তিনি এই দীক্ষা গ্রহণ করেন। দেওয়ান বাহাদুরের ছেলে পাবনাতে মুন্সেফ থাকাকালে তিনি আশ্রমেগিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রদা আদরের সহিত আমাকে "তুমি" সম্বোধন করিতেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলিতেন—"যেহেতু আমার জ্যেষ্ঠ ছেলে সুধীরের (সেও ব্যারিষ্টার) সমবয়স্ক, তাই আমি বাৎসল্যের সহিত "তুমি" সম্বোধন করিয়া থাকি। আবার তোমার বিশ্বাস ও জ্ঞানের দিক দিয়া যখন বিচার করি তখনই শ্রদ্ধায় অবনত হই, এই কারণেই বয়োবৃদ্ধ হইয়াও তোমার নিকট দীক্ষা নিয়াছি। যখনই তাহার বাসায় কার্য্যোপলক্ষে যাইতাম তখনই তিনি অতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে আমায় গ্রহণ করিতেন। আর তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় ন্যূনপক্ষে দু'এক ঘণ্টা চলিয়া যাইত। আলোচনান্তে জলযোগ না করাইয়া কিছুতেই তিনি ছাড়িতেন না।

কথিত সময়ে সৎসঙ্গের যাজনে ঢাকা সহর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। লোক সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বাসায় বাসায় জোরে সৎসঙ্গ চলিল। ক্ষিতীশদার বাসায় নিত্য-নূতন লোক সমাগমে উহা যেন এক আনন্দমঠ হইয়া উঠিল। ঢাকা হইতে মাঝে মাঝে যাজন উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জ টাউনেও যাতায়াত করিতে লাগিলাম। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপালিটির হিসাব পরীক্ষার ভারও ক্ষিতীশদার উপর ছিল। বিনোদবিহারী পাল তৎকালে মিউনিসিপাল কমিশনার। অডিট উপলক্ষেই বিনোদ পালের সহিত ক্ষিতীশদার পরিচয়। ঐ সূত্রেই তিনি বিনোদ পালের সহিত আমারও মিলামিশার সুযোগ করিয়া দিলেন। তৎপরেই তাহার বাড়ীতে এক সভার উদ্যোগ হইল।

ইহার পরেই বিনোদদা নিজে দীক্ষা নিলেন। আবার তাহার চেষ্টায় আরও কিছু সংখ্যা বাড়িল। বিনোদদা নারায়ণগঞ্জ টাউনে খ্যাতনামা পাল পরিবারের সন্তান। পালদের মধ্যে তিনিই উচ্চশিক্ষিত ও চৌকস ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাহারই সহায়তায় নারায়ণগঞ্জ টাউন, দেওভোগ, বন্দর, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্, লক্ষীনারায়ণ কটন মিলস্ প্রভৃতিতে সৎসঙ্গের ভাবধারা বিস্তারের সুযোগ হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইন্দুহরণদার (মুখার্জি) জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীর গোদনাইল জলের কলের কারখানায় চাকুরি করিত। তাহার আফিস হইতে ঐ সকল "মিল" কাছে থাকায় মিলের অনেকের সহিত তাহার পরিচয় ছিল। সেই সুযোগেও তাহার সহায়তায় ঐ সমস্ত মিলের লোকদের মধ্যে যাজনের অনেক দিক দিয়া সুবিধা হইল। যখনই যেখানে আবশ্যক হইত বিনোদদা বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সাথে যাজনে বাহির হইতেন। তাহার এই এক গুণ ছিল, যাহা বলিতেন তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতেন, আর সৎসঙ্গ অধিবেশন যেখানেই হইত কোন প্রকার সংবাদ পাইলেই সেখানে যাইয়া যোগদান করিতেন। বিনোদদার আর একটি বিশেষত্ব ছিল, প্রত্যেক ঋত্বিক সম্মিলনীতেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। এমন কি শ্রীশ্রীঠাকুর দেওঘর

চলিয়া আসার পরেও তাহার এই প্রকার উপস্থিতির ব্যতিক্রম হয় নাই। বিগত ১৩৫৭ সনের আশ্বিন মাসের ঋত্বিক সম্মিলনীতে বিনোদদা উপস্থিত ছিলেন না। অতঃপর অনুসন্ধানে জানা গেল, যে তিনি অসুস্থ। ইহারই একমাস মধ্যে কলিকাতায় সংবাদ পাইলাম বিনোদদা নারায়ণগঞ্জ তাঁহার পৈতৃক বাড়ীতে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

অধ্বর্য্যু হইয়া বহু বৎসর তিনি আমার যাজনের সাথী ছিলেন। জীবিত কাল পর্য্যন্ত ইষ্টভৃতি ও স্বস্ত্যয়ণী তিনি আগাগোড়া নিয়মিতভাবে পালন করিয়াছিলেন। বিনোদদা কৃতকার্য্যতার সহিত সর্ব্বত্র চলিতে যে পারিয়াছেন, তাহার মূল ভিত্তিই ছিল—বলার সঙ্গে করার অভ্যাস।

ঢাকা টাউনে কয়েক বৎসর উকিল মহেন্দ্রদা, উকিল প্যারীদা ও ডাঃ অমৃতদার বাসার সৎসঙ্গের অধিবেশন নিয়মিত ভাবে চলিয়াছিল। উঁহাদের পরলোক গমনের পরে নবাবপুর বড় রাস্তার উপর কবিরাজ নলিনীকান্ত সেনের বাসার একাংশে ঐ অধিবেশন হইত। দীর্ঘ কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা—আমি এক সময়ে যাজন উপলক্ষে বেলঘরিয়া, সিঁথি, ঘুঘুডাঙ্গা ও কোন্নগর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন ছিলাম। নলিনীকান্ত সেন তখন সিঁথিতে কবিরাজী চিকিৎসক। তিনি মেডিকেল স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ডাক্তারও ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ব্যবসায় ছিল কবিরাজী। নলিনীদা কলিকাতার স্বনামধন্য কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনের ছাত্র। সিঁথিতেই ঐ সময়ে তিনি আমার নিকট হইতে এই সৎনাম গ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই নলিনীদা ঢাকা-আয়ুর্ব্বেদ ফার্ম্মাসীর প্রধান কবিরাজ হইয়া সিঁথি হইতে ঢাকা চলিয়া আসেন। প্রথমে তাহার বাসা তাঁতিবাজার ছিল। সেখানেও সুবিধা মত মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ হইত। কিছুকাল পরে তিনি ঐ বাসা ছাড়িয়া দিয়া নবাবপুর চলিয়া আসেন। এই সময়েই তাহার বাসার একাংশ সাপ্তাহিক অধিবেশনের জন্য নিয়া ব্রজগোপাল দত্তরায় তথায় থাকিয়া ঢাকা টাউনে

সৎসঙ্গের ভাবধারা বিস্তার করিতে থাকেন। আমি ব্রহ্মদেশে যাজনে নিযুক্ত থাকার অন্তবর্ত্তীকালে ব্রজগোপালদার কার্য্যারম্ভ। এই কার্য্যে তিনি ঢাকা অনধিক দুই তিন বৎসর ছিলেন। ইহার পরে সৎসঙ্গ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ও টিউব ওয়েলের কার্য্য সংশ্রবে রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ঢাকাতে কিছুকাল ছিল। সেই সময় সেও উদ্যোগী হইয়া সৎসঙ্গীদের বাসায় বাসায় সাময়িক সৎসঙ্গ অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তৎপরে কিছুকালের জন্য অধিবেশন বন্ধ থাকে। ইহার কয়েক বৎসর পরে আবার বলরাম সাহা উকিলের বাসায় এক অধিবেশন কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়। তখন তাহার বাসা জিন্দাবাহার। সেই সৎসঙ্গ অধিবেশন সন ১৩৪৪-৫০ পর্য্যন্ত পূর্ণ ছয় বৎসর কাল একাদিক্রমে নিয়মিত ভাবে চলিয়াছিল। আমাদ্বারাই ঐ অধিবেশন কেন্দ্রের উদ্বোধন, আমাকেই তথায় থাকিয়া উহার পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। তখন আমি ব্রহ্মদেশ হইতে দেশে চলিয়া আসিয়াছি। ঢাকা জেলার যাবতীয় যাজন তৎসময়ে ঐ বাসায় থাকিয়াই আমি করিতাম।

বলরামদার দীক্ষা এক আকস্মিক ঘটনা হইতে। কলাকোপা নিবাসী সৎসঙ্গী সুদর্শন রায় ও তাহার ভ্রাতাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন নিয়া এক আত্মকলহ উপস্থিত হয়, আর ক্রমাগত মোকদ্দমা চলিতে থাকে। বলরামদা উঁহাদের একপক্ষের নিযুক্ত উকিল ছিলেন। ডাঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দাস সঃ প্রঃ ঋত্বিক—উক্ত রায় পরিবারের দীক্ষাদাতা। এই কারণেই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আপোষে মীমাংসার চেষ্টা করিতে থাকেন। রায় ভ্রাতাগণও এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভার ব্রজেনদার উপর ছাড়িয়া দেন। এই সম্পর্কে কোন দলিল লেখা উপলক্ষে ব্রজেনদা ও বলরামদার মধ্যে বচসা উপস্থিত হয়, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে হাতাহাতি, শেষ পর্য্যন্ত উহাই ধস্তাধস্তিতে পর্য্যবসিত হয়। বলরামদার প্রবল টানাটানিতে ব্রজেনদার পরিধেয় বস্ত্র ও গায়ের একটি নূতন জামা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই ঘটনাতে ক্ষুব্ধ ও নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া ব্রজেনদা তখনই কোর্টে গিয়া হাকিমের নিকট বিচার প্রার্থনা করেন।

তাহার ঐ অবস্থা দেখিয়া হাকিমের করুণার উদ্রেক হয়। তিনি তখনই বারের একজন প্রবীন উকীলকে সংবাদ দিয়া নিয়া মীমাংসার কথা বলিয়া দেন। বলরামদা মীমাংসা করিতে রাজী না হওয়ায় হাকিমের অগত্যা মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে হইল। ইহার পরেও হাকিম আপোষের উদ্দেশ্যে মোকদ্দমার শুনানীর তারিখ অনেক পিছাইয়া দিলেন। ইত্যবসরে উকীলদের পরামর্শে বলরামদা আপোষে রাজী হন। তখন ব্রজেনদা তাহাকে এই কথা জানাইয়া দিলেন—আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে আপোষ হইবে, অন্যথা হইবে না। এই প্রস্তাবে বলরামদাও কোন আপত্তি করিলেন না। ব্রজেনদার এই রকম করার মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল—কোন প্রকারে বলরামদাকে আশ্রমে নিয়া সেই সুযোগে "নাম" দেওয়া। ঐ প্রস্তাব অনুসারে বলরামদা, ব্রজেনদা, সুদর্শন রায় ও তাহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা একসাথে হিমাইতপুর রওনা হয়। তখন ঋত্বিক সম্মেলনের মাত্র দুই দিন মাঝে আছে। এই জন্য আমিও তাহাদের সাথী হইলাম। এই সম্মিলিতভাবে আমরা ১৩৪৪ সনের বড়দিনের বন্ধের সময়ে আসিয়াছিলাম।

আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনের পরেই বলরামদা "নাম" গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ মতে তিনি আমার নিকট হইতেই "নাম" নিলেন। দীক্ষার পরক্ষণেই ব্রজেনদা আসিয়া বলরামদাকে আলিঙ্গন করিলেন আর আনন্দের সহিত বলিয়া ফেলিলেন—যে তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। ইহার পর হইতে ব্রজেনদা ও বলরামদার মধ্যে এত প্রণয় হইল যে তাহা দেখিয়া কিছুতেই বুঝা যাইত না উহাদের মধ্যে কখনো কোন মনোমালিন্য হইয়াছিল। তদবধি ব্রজেনদাও সচরাচর বলরামদার বাসায় আসিতেন, বলরামদাও সুযোগ মতে তাহার বাড়ীতে যাইতেন। আর মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে প্রীতি ভোজনও হইত।

ঐ যাত্রা আশ্রম হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই আমি বলরামদার বাসায় গেলাম। সেই সুযোগে তাহার স্ত্রী ও একটি কন্যা "নাম"

নিয়াছিল। উঁহাদের দীক্ষা কার্য্য শেষ হওয়ার পরমুহূর্ত্তেই বলরামদা আর ঐ বউমা (বলরামদার স্ত্রী) তাহাদের বাসায় থাকিয়া তথা হইতে যাজন কার্য চালাইবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া ধরেন। তাহাদের একান্ত আগ্রহেই তখন ঐ বাসায় আসিতে হইল। তদবধি একাদিক্রমে ছয় বৎসর কাল তাহাদের বাসায় ছিলাম। আর ওখান হইতে ঢাকা জেলার সর্ব্বত্র যাজন কার্য্য চলিয়াছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যখন চাউল মহার্ঘ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, সেই সময়েও আমি বলরামদার বাসায় ছিলাম। অন্য কোথাও গিয়া থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই বলরামদা ও তাহার বাড়ীর বউমা উভয়েই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেন। আর আবেগের সহিত ইহাও প্রকাশ করিতেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত সক্ষম ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আমাকে অন্যত্র যাইতে দিবে না, যখন যা' জুটে তাহাই দিবে। আমার প্রতি তাহাদের কত দরদ তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না। বলরামদা ও তাহার স্ত্রী উভয়েই আগাগোড়া সমভাবে আমার যত্ন নিয়াছেন। এই প্রকার দম্পতি কদাচিৎ দেখা যায়।

ঐ নিদারুণ সঙ্কট কালেই ১৩৪৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ দিয়া দশজন কর্ম্মীসহ একটী দল নিয়া প্রতিনিধি নায়ক শ্রদ্ধেয় প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ক্ষেপুদা) আশ্রম হইতে ঢাকায় আগমন করেন। তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র হালদার এম এ বি এল, ভোলানাথ সরকার প্রতি ঋত্বিক, নিবারণ চন্দ্র বাগচী, রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য আরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁহাদের খাওয়া ও থাকার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য ঐ সময়ে বলরামদা যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত তদ্বির-তালাসী করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুভদ্যার ডাঃ বজেন্দ্র কুমার দাসের নামও এই সম্পর্কে অধিকতর উল্লেখনীয়। সেই বিবরণ পশ্চাতে আছে। ঐ কর্ম্মীদল ঢাকা হইতে আশ্রমে চলিয়া যাওয়ার কিছুকাল পরেই ঢাকাতে রায়ট লাগিয়া যায়

এবং উহা দীর্ঘকাল চলিতে থাকে। এই কারণে ছোরা-মারা, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি ক্রমাগত লাগিয়াই ছিল। এই সময়েই বলরামদা জিন্দাবাহারের ঐ বাসা ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান দিগবাজার চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। দিগবাজারের বাসা খুবই ছোট ছিল। তাই ঐ সময়ে লক্ষীবাজার ৺লক্ষীনারায়ণজীর বাড়ী সংলগ্ন নন্দলাল শর্ম্মার বাড়ীতে ঐ অধিবেশন স্থান করা হয়। নন্দদা আমার নিকট হইতেই "নাম" নিয়াছিলেন। * সৎসঙ্গের একনিষ্ঠ কর্ম্মী রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার চাকুরী উপলক্ষে তখন ঢাকায় ছিল। তাহার বাসা ছিল লক্ষীবাজার মালীগলিতে। অসুস্থ হইয়া সে যখন ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া যায় সেই সময়ে সৎসঙ্গের অধিবেশনের জন্য উক্ত বাসা আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া যায়। তখন সেই বাসা ভাড়া নিয়া ঢাকা টাউনে স্বাধীন এক অধিবেশন কেন্দ্র করা হয়। ওখানে এক বৎসর থাকার পরেই বাড়ীর মালিকের একান্ত অনুরোধে উক্ত বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইল। অনন্তর রামকৃষ্ণমিশন রোডে এক বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়। তথায় অধিবেশন ভালভাবেই চলিতেছিল। ইহার কিছুকাল পরেই দেশ-বিভাগ। ঢাকা পাকিস্থানের মধ্যে পড়িয়া যায়। তাই ১৩৫৪ সনের মাঘ মাসে উক্ত বাড়ীও ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

---

* ঢাকা ৺লক্ষীনারায়ণজীর বাড়ী ঐ অঞ্চলে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। উহার সেবাইত রাজাবাবু অতিশয় নাম করা লোক ছিলেন। নন্দলাল শর্ম্মা ঐবংশের সন্তান। ঢাকাতে নন্দদার একখানা রেশন সপ ছিল। দেখিয়াছি, তিনি কখনো কোন মাল ব্ল্যাক করেন নাই। চাউল, আটা, চিনি, কেরাসিন যাহাই উদ্বৃত্ত হইত তাহাই তিনি সাধারণ লোকদিগকে খরিদমূল্যে দিতেন। এইজন্য ঢাকা টাউনে তাহার সুনাম ছিল।

প্রতিনিধি মহাশয়ের ঢাকা আগমন সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—ঐ সঙ্গর উপলক্ষেই তাঁহার ঢাকেশ্বরী-কটন-মিলস এর কারখানা দেখা, আর মিলের কর্ম্মিগণের মধ্যে শরৎদার বক্তৃতা। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন ঢাকা-বারের উকীল বিধুনাথ ঘোষদস্তিদার এম এ বি এল। তিনি সস্ত্রীক আমার নিকট দীক্ষিত। সুতরাং আমার প্রতি তাহার স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের প্রস্তাব মতেই তিনি আমাকে ও শরৎদাকে সাথে নিয়া ডিরেক্টর সুর্য্যবাবুর বাসায় যান। বিধুদার অনুরোধেই ডিরেক্টর সুর্য্যবাবু তখনই বাসা হইতে ফোনে মিলের ম্যানেজার আশুবাবুকে মিল দর্শন ও বক্তৃতার সম্পর্কে অনুমতি জানাইয়া দেন।

এই উপলক্ষেই সুর্য্যবাবু হিমাইতপুর সৎসঙ্গ সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত হন এবং স্বতঃ ইচ্ছায় আশ্রমের কর্ম্মিদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য শতাধিক ধুতী কাপড় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। উক্ত কাপড় মিল হইতে নিজ খরচায় যথাসময়ে পাঠাইয়াও ছিল। এই জন্য সুর্য্যবাবু আমাদের কাছে চিরদিনের জন্য ধন্যবাদের পাত্র। সুর্য্যবাবু যে এত বৃহৎ বৃহৎ মিল স্থাপন ও কৃতিত্বের সহিত পরিচালনা করিতে সমর্থ, তাহার মূলে কিন্তু পারিপার্শ্বিকের প্রতি সেবাবুদ্ধি।

বিশেষ দীক্ষা বিগত ১৩৫২ সনের আশ্বিন মাসে ঋত্বিক সম্মিলনীর অব্যবহিত পরেই একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সমক্ষে দীক্ষা সংক্রান্তে নানা কথা উত্থাপিত হয়। তখন তিনি High Calibre লোক সংগ্রহের জন্যই বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। আমার প্রতি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ভাবেই তিনি এই ইঙ্গিত করিলেন। আমিও তৎক্ষণাৎ নতশিরে স্বীকৃতি জানাইলাম। ইহার কয়েক দিন পরেই আমি আশ্রম হইতে ঢাকা চলিয়া আসিলাম। তথায় পৌঁছারস ঙ্গে সঙ্গে সূত্র ধরিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাজন আরম্ভ করিলাম। সেই সময়েই ডক্টর অতুলচন্দ্র বসু পি এইচ ডি (লণ্ডন), ডক্টর সর্ব্বানীসহায় গুহসরকার ডি এস সি (লণ্ডন) আর অপূর্ব্বকুমার ঘোষ এম এস সি (কর্ণেল

কলেজ ক্যালিফর্ণিয়া) "নাম" নেন। দীক্ষা গ্রহণের অল্পদিন পরেই অতুলদা ও বৃন্ধ অপূর্ব্বদা উভয়ে একত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে হিমাইতপুর আসেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা কয়েকদিন আশ্রমে ছিলেন।

১৩৫৪ সনের আষাঢ় মাসে হিমাইতপুর আশ্রমে কলেজ স্থাপিত হয়। উক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করণ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়েরপক্ষ হইতে ইনস্পেক্টর সতীশচন্দ্র ঘোষ কলেজ পরিদর্শনার্থ হিমাইতপুর আশ্রমে আসেন। তদুপলক্ষে বিশ্ববিজ্ঞানের যাবতীয় যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করাইবার ও কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সমস্ত ভার অতুলদার উপর দেওয়া হয়। পরিদর্শক মহোদয়ের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই কয়েকজন ছাত্রকর্ম্মী নিয়া অতুলদা বিজ্ঞানাগারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি যথাস্থানে সুবিন্যস্ত ভাবে সাজাইয়া রাখিবার কার্য্যে ব্রতী হন। ঐ সময়ে এমনও দেখিয়াছি, ছাত্র-কর্ম্মীদের সহিত তিনি স্বহস্তে কোদালি দ্বারা বিল্ডিং-এর আশেপাশের জঙ্গল ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার করণ অবধি ঝাড়ুদ্বারা সমগ্র গৃহের ঝুলঝাট ইত্যাদি নিজেই অপসারণ করিয়াছেন। উচ্চশিক্ষার সহিত এই প্রকার গুণ ও কর্ম্মপ্রবণতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

জয়দেবপুর ভাওয়াল—সর্ব্বপ্রথমে গিয়াছিলাম ১৩২৮ সনের চৈত্র মাসের শেষ ভাগে। আমার স্ব-গ্রামবাসী বগলাপ্রসন্ন বিশ্বাস বি এ সেই সময়ে তথায় রাণীবিলাসমণি হাইস্কুলের হেডমাষ্টার। তাহারই বাসায় গিয়া উঠিয়াছিলাম। সাক্ষাৎ হওয়ার পরেই আমার তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য তাহাকে জানাইলাম। তিনিও তদনুসারে পরদিন স্কুলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও আগে বক্তৃতা, তৎপরে পাকা-রং-প্রণালী পুস্তকের প্রকরণগুলি শিক্ষক ও ছাত্রদের সমক্ষে দেখান হইল। উহার মধ্য দিয়াই সূত্র ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারার আংশিক অবতারণা করা হইল। তৎকালে স্কুলে স্কুলে এই প্রকার বক্তৃতা করার সময় ও সুযোগ পাওয়ার একমাত্র অবলম্বনই ছিল পাকা-রংপ্রণালী পুস্তক। উহার প্রকরণগুলি দেখার ঔৎসুক্যেই শিক্ষকগণ আগ্রহের সহিত স্কুলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেন।

যাজন উদ্দেশ্যে আরো কয়েকদিন জয়দেবপুর রহিলাম। তাহার ফলে কয়েকজন "নাম" নিলেন। তন্মধ্যে রাজকুমারদের ভাগিনেয় একজন। মধ্যম কুমার জীবিত—সন্ন্যাসীবেশে ঁকাশীধাম আছেন—এই জনরবও তখন শুনিয়া আসিলাম। এই ঘটনার বৎসরাধিককাল পরেই সন্ন্যাসীবেশে মধ্যম কুমারের ঢাকায় আগমন। তখন ঢাকা আর জয়দেবপুর এই বিষয় নিয়া বিরাট আন্দোলন চলিয়াছে। এই সময়েই সঙ্ঘভ্রাতা ক্ষিতিশচন্দ্র সান্যাল রাজ-ষ্টেটের হিসাবপত্রাদি পরীক্ষার্থে জয়দেবপুর আসেন। এই কার্য্যের জন্য দুইবৎসরের অধিককাল তাহাকে জয়দেবপুর থাকিতে হইয়াছিল। তৎকালে তাহার বাসা রাজপ্রাসাদের অন্দর ভাগেই ছিল। তিনি সপরিবারে তথায় থাকিতেন। এই সময়ে ক্ষিতিশদার আমন্ত্রন পত্র পাইয়া আবার জয়দেবপুর গিয়াছিলাম। ক্ষিতীশদা সরকার হইতে নিযুক্ত অডিটর, আমি তাহার আমন্ত্রিত অতিথি, সুতরাং ষ্টেটের কর্ম্মচারীগণ আমাকে বিশেষ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন।

ষ্টেশন হইতে রাজবাড়ী অর্দ্ধ মাইলের অনধিক। এই সামান্য পথও বগী পাঠাইয়া তাহারা আমাকে নেওয়াইলেন। ষ্টেশনে আমাকে গ্রহণ করার জন্যও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাজবাড়ীর ফটকের নিকটে পৌছার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাইভেট সেক্রেটেরী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগের দ্বিতলের এক কামরায় আমার থাকার ব্যবস্থা হইল। শুনিতে পাইলাম ঐ সমস্ত কক্ষ রাজকুমারদেরই বিশ্রাম ঘর। সেক্রেটেরীবাবু রাত্রিতে আমার তত্ত্বাবধান নেওয়ার জন্য এক হিন্দুস্থানী প্রাচীন দ্বারোয়ানকে নিযুক্ত করিলেন। রাত্রিতে রাজপ্রাসাদে শয়ন করিয়া মনে মনে এই ভাবিয়া একটু হাসিলাম—পরমপিতার কি বিচিত্র খেলা! আজ তাঁহার বার্ত্তাবহ হইয়া ভাগ্যে রাজপ্রাসাদে অবস্থান—রাজ-অতিথির সুখশয্যায় শয়ন। এই মুহূর্ত্তে দ্বারোয়ানজীও আমার তত্ত্ব-তালাসীর জন্য গৃহমধ্যে

আসিয়া উপস্থিত। শুনিয়াছে ধর্ম্মযাজক। তাই সে প্রাণ খুলিয়া আমার সাথে আলাপ আরম্ভ করিল। বর্ণে সে বিপ্র। তাই শাস্ত্রের উপর আস্থা আছে এই প্রমাণও পাওয়া গেল। সর্ব্বপ্রথম সে ধর্ম্ম বিষয় নিয়া কথাবার্ত্তা উত্থাপন করিল। আমার যুক্তি শুনিয়া সে যে আকৃষ্ট হইয়াছে ইহাও বুঝিতে পারিলাম। আমাকে সাধু মনে করিয়া সে তখন অকপট-চিত্তে সন্ন্যাসীকুমার সম্পর্কে তাহার নিজস্ব ধারণা খুলিয়া বলিল। সন্ন্যাসী যে মধ্যমকুমার ইহা তাহার দৃঢ় প্রত্যয়। বাল্যকালে রাজকুমারদের সে যে কোলে-কাঁধে নিয়াছে, খেলা-ধূলা ব্যায়াম ইত্যাদি শিখাইয়াছে, ইহাও সে ব্যক্ত করিল। মধ্যম কুমারের কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে তাহার আবেগ আকুলতা যেরূপ দেখিলাম তাহাতে তাহার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

অপর এক বৃদ্ধা মহিলা—বয়স ষাইটের উর্দ্ধে—তাহার নিকট যাহা শোনা গেল তাহাতেও দ্বারোয়ানজীর কথারই সমর্থন পাইলাম। এই বৃদ্ধা মহিলার বিধবা এক কন্যা আমার নিকট হইতে “নাম” নিয়াছিল। তাহার বিবরণ সন্দেহ করিবার কোন হেতু দেখিলাম না। ঐ যাত্রা জয়দেবপুর যে কয়দিন ছিলাম যাজন বেশ জোরেই চলিয়াছিল। প্রতিদিন আলোচনাকালে ষ্টেটের কর্ম্মচারীগণ যথাসময়ে উপস্থিত থাকিতেন এবং মনোযোগের সহিত আগাগোড়া সমস্ত শুনিতেন। সেক্রেটারী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সুযোগমতে আমাকে নিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেন। তাহার ব্যবহারও আমার প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ছিল। তিনি একজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিও ছিলেন। পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শাস্ত্র-জ্ঞান সম্পর্কে একটি উপাধিও তিনি পাইয়াছিলেন। সেক্রেটারীবাবুর এইদিকে অনুরাগ ছিল বলিয়াই আলোচনা করার এত সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ সময়েও কতিপয় ব্যক্তি আমার নিকট হইতে “সৎমন্ত্র” গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদবধি ক্ষিতীশদার বাসায় নিয়মিতভাবে সৎসঙ্গের অধিবেশন হইতে লাগিল।

যতদিন তথায় তিনি ছিলেন উহা সুষ্ঠুভাবেই চলিয়াছিল। জয়দেবপুর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তনের পরে আমি সন্ন্যাসীকুমারকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ঢাকা-বারের প্রবীণ উকিল মহেন্দ্রলাল রায় আমাকে নিয়া গিয়াছিলেন। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর রাজপুত্রতুল্যই চেহারা বটে। কথা বার্ত্তা হইতে বুঝা গেল জিহ্বা আড়ষ্ট। আমরা অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সেখানে ছিলাম। এই সময় মধ্যে দৈবঔষধের জন্য বহু লোককে কুমারের নিকট যাওয়া আসা করিতে দেখিলাম। এই সম্পর্কে এখানেই ইতি করা গেল, যেহেতু সকলেই কুমারের মোকদ্দমার ফলাফল জানেন।

আনন্দময়ীমারকথা—

বিগত ১৩৩১ সনের চৈত্র কি বৈশাখ মাসে আনন্দময়ীমার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। তৎসময়ে তাঁহার বাবা ও মা ঢাকা-বারের বিখ্যাত উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষের শাহাবাগস্থিত বাগানবাড়ীতে ছিলেন। আনন্দময়ীমাও আশ্রম হইতে রাত্রিতে তথায় গিয়া বাবামার কাছে থাকিতেন। মায়ের উদ্দেশ্যে আমরা যখন গিয়াছিলাম সেই সময়ে তিনি ওখান হইতে রমণা আশ্রমের দিকে আসিতেছিলেন। তখন প্রাতঃ সাতটার অনধিক। অবসর প্রাপ্ত পুলিশ অফিসর রাইমোহন মুখোপাধ্যায় তাহার সাথে আমাকে নিয়া গিয়াছিলেন। রাইমোহনদার জ্যেষ্ঠা কন্যা আমার নিকট হইতে "নাম" নিয়াছিল। সেই সূত্রে তিনিও আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ঘোড়-দৌড়ের মাঠ পার হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরেই আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইলাম—মায়েরা কয়েকজন সেই সঙ্গে কতিপয় পুরুষ কাতার দিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে আসিতেছেন। তখন রাইমোহনদা অঙ্গুলী সঙ্কেতে জানাইলেন—ঐ আনন্দময়ী-মা আসিতেছেন। আমিও এই ইঙ্গিত পাইয়া মায়ের নিকটে যাওয়ার জন্য দ্রুত চলিতে থাকিলাম। তাহাতে রাইমোহনদা বলিলেন—অপরিচিত আমরা, মেয়েদের কাছে এইভাবে যাওয়া সঙ্গত হবে কিনা? সন্তান

মায়ের কাছে যাবে তা'তে সঙ্কোচের কি আছে ? দাদা ! বলিয়াই আমি আনন্দময়ীমার সম্মুখে গিয়া "মা" সম্বোধন করিলাম। তিনিও তৎক্ষণাৎ আমাকে "বাবা" সম্বোধনে ডাকিয়া নিকটে নিলেন। অতঃপর সকলে সরাসর রমণা আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আশ্রমের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একখানা লম্বা টিনের ঘরের বারান্দায় গিয়া মা উপবেশন করিলেন। আমি ও রাইমোহনদা মায়ের নিকটে একপার্শ্বে বসিলাম। আর অন্যান্য সঙ্গীগণ সেইভাবে আশেপাশে স্থান নিলেন। ইতিমধ্যে এক প্রাচীন ব্যক্তি মায়ের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। পরিচয়ে জানিলাম তাঁহার নাম ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী, তিনি অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনিও অতিশয় আলাপী তাই অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল।

বিদায়কালে তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া গেলেন। অনুরোধ রক্ষার্থে আমি তাঁহার বাসায় গিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে তাঁহার লিখিত কয়েকখানা পুস্তকও তিনি আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। মিলামিশায় বুঝিতে পারিলাম বৃদ্ধ বেশ সদাশয় ও ধর্ম্মানুরাগী। আশ্রম হইতে ভবানীবাবু চলিয়া যাওয়ার পরেই আমি আনন্দময়ীমার সাথে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। সৎসঙ্গের নাম শুনিয়াই মা অতিশয় উৎফুল্ল হইয়া আবেগের সহিত প্রকাশ করিলেন—তিনি হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়াছিলেন, তিনদিন তথায় ছিলেন ; শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার অনেক আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, কিশোরীদার নৃত্য-কীর্ত্তনও তিনি দেখিয়াছেন, ঐ নৃত্য-কীর্ত্তনে স্বল্পকাল থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রচুর আনন্দ পাইয়াছিলেন। এই সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া মায়ের নিজস্ব তথ্য যৎকিঞ্চিৎ তখন জানিয়া নিলাম।—তাঁহার স্বামী একসময়ে চাকরি উপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলার বাজিতপুর ছিলেন। তখন তিনি তথায় স্বামীর সহিত পরিবার ছিলেন। ঐ সময়েই আগন্তুক এক সন্ন্যাসী হইতে

আনন্দময়ীমা মন্ত্র পান। তদবধি তাঁহার জীবনে এক অভিনব অধ্যায়ের সূচনা হয়। এই পর্য্যন্ত বলার পরেই মা আমাকে নিয়া নাম-ঘরে গেলেন। এখানেই ঐ আশ্রমের নাম-কীর্ত্তন, গ্রন্থাদি পাঠ ও আলোচনা ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। নাম ঘরে প্রবেশ করিয়া মা আমাকে তাঁহার নিকটে বসিতে বলিলেন। আমাকে সৎসঙ্গের প্রচারক ও শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ প্রাপ্ত মনে করিয়াই মা যেন আমার প্রতি এত যত্ন নিলেন। আসরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই কিশোরীদার অনুরূপ নৃত্য-কীর্ত্তন করিবার জন্য মা আমার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই অনুরোধ তখন আমাকে রক্ষা করিতে হইল। কিছুক্ষণ আমি নিবিষ্টভাবে মগ্ন থাকিয়া অতঃপর দাঁড়াইয়া "পতিতপাবন নাম রাধা বল" এই তান ধরিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম। ওখানে "মা" "মা" কীর্ত্তন হইতেছিল। তখন ঐ কীর্ত্তন ছাড়িয়া সকলেই "রাধা বল" এই বোল ধরিল; এইভাবে কিছুক্ষণ তুমুল কীর্ত্তন চলিল। আমিও তৎসঙ্গে যন্ত্রের পুতুলের ন্যায় নাচিতে থাকিলাম। প্রায় পূর্ণ একঘণ্টাকাল এই অবস্থায় লগ্ন থাকার পরে ক্লান্ত হইয়া আমি ঐ আসরেই শুইয়া পড়িলাম। তখনই আনন্দময়ীমা দ্রুত চলিয়া আসিয়া আমার মাথা হাটুতে রাখিয়া নিজেই পাখা দ্বারা বাতাস করিতে থাকিলেন। ঐ অবস্থায় আমি যে পিপাসার্ত্ত মা অনুভব করিতে পারিলেন। আমার মুখ যে তখন শুকাইয়া যাইতেছিল—ইহাও যথার্থ। তাই আনন্দময়ীমা অকস্মাৎ ঐ স্থান হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই এক গ্লাস দধির সরবত আর দুটা সন্দেশ নিয়া আসিলেন। নিজ হাতেই মা তাহা আমাকে খাওয়াইলেন।

আরও কিছুকাল বিশ্রামের পর আমি ও রাইমোহনদা বাসায় ফিরিলাম। মা ওখানে প্রসাদ পাওয়ার কথা বলিয়াছিলেন কিন্তু অন্যত্র মধ্যাহ্ন আহারের স্বীকৃতি ছিল, তাই চলিয়া আসিতে হইল। বিকালে পুনরায় আশ্রমে যাওয়ার জন্য মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন।

অপরাহ্ন চারিটায় আমি ও রাইমোহনদা পুনরায় রমণা আশ্রমে গেলাম। আশ্রমে প্রবেশ করিতেই রঙ্গিন কৌপীন পরিহিত এক ব্রহ্মচারীর সহিত দেখা হইল। ইনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া অকস্মাৎ এই উক্তি করিলেন—আপনি-না সেই ঘণ্টানন্দ স্বামী? মুক্তাগাছা হরিসভায় ঘণ্টা শব্দের কথা বলেছিলেন। তখন সাত্ত্বনয়ে তাঁহাকে জানান হইল—আমি স্বামিজী নহি, একজন সাধারণ গৃহস্থ মাত্র; আমার প্রতি এইরূপ কোন উপাধি প্রয়োগ করিলে অবিচার করা হইবে। তৎপরে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে বলিলাম মুক্তাগাছা হরিসভার সমাবর্ত্তন উৎসবে আমি আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম, ঐ উপলক্ষে আমার বক্তৃতা হইয়াছিল, ইহাও সত্য, আর সেই বক্তৃতার বিষয়বস্তু মধ্যে "নাদতত্ত্ব" সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল, ইহাও ঠিক। আপনি আমায় চিনেছেন বটে, কিন্তু আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই। অনুসন্ধানে শেষে জানিতে পারিলাম তাহার নাম শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারী—কাশীধামে থাকেন। ইহার সঙ্গে এখানেই ইতি করিয়া আমি ও রাইমোহনদা আনন্দময়ীমার উদ্দেশে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। আনন্দময়ীমাও আশ্রমের ভিতর হইতে তখন কয়েকজন স্ত্রীলোকসহ বাহিরের দিকে আসিতেছিলেন। আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া তিনি অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তৎসঙ্গে ইহাও জানাইলেন ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিয়া পরে আমাদের সাথে কথাবার্ত্তা বলিবেন। তদনুসারে আশ্রমের বহির্ভাগস্থিত প্রান্তরের একপ্রান্তে বসিয়া আমি ও রাইমোহনদা মায়ের অপেক্ষায় রহিলাম। এমন সময়ে আবার সেই ব্রহ্মচারী কতিপয় ব্যক্তিসহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আলোচনা উপলক্ষ করিয়া আমার সহিত কুটতর্ক আরম্ভ করিলেন। তৎসাথে ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় তাহার অপর সঙ্গীগণও আমার উপর প্রশ্নের পর প্রশ্ন চাপাইতে থাকিলেন। হাবেভাবে বুঝাগেল জানার উদ্দেশ্যে কিছুই নয়, যাহা কিছু প্রশ্ন তর্কের জন্য। রাইমোহনদা ভাবগতিক দেখিয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, আর আমাকে নিয়া সরিয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র

হইলেন, কিন্তু আনন্দময়ীমার কথা রক্ষা করার জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে হইল। উহারা কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না বরং তর্কের মাত্রা বাড়াইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আরো বাগবিতণ্ডা সৃষ্টি করিতে থাকিলেন। এমন সময়ে আনন্দময়ীমাও অকস্মাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। যাহারা তর্ক করিতেছিল তাহাদিগকে তিনি এই বলিয়া সমঝাইয়া দিলেন—যে তিনি নিজে হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ কথাবার্ত্তা হইয়াছে; আশ্রম সম্পর্কে তাঁহার সবিশেষ জানা আছে। আর যাহার সহিত তর্ক করা হইতেছে তিনিও যে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদিষ্ট একজন প্রচারক, ইহাও তিনি জানেন। সুতরাং তর্ক না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা হওয়াই বরং ভাল ছিল, ইহাও শেষ পর্য্যন্ত তিনি ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর মা আমাদের সহিত যাহা বলার ছিল বলিলেন। ইহার পরে বিদায় নিয়া আমি ও রাইমোহনদা চলিয়া আসিলাম। শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারীর এই বিবরণ যখন এই পুস্তকে লিখিতেছিলাম ঠিক সেই সময়েই ঘটনাচক্রে অমূল্যকুমার সেন উকিল লিখিত "শ্রীশ্রীআনন্দময়ীমা" পুস্তকখানা আমার হাতে পড়ে। দেওঘর লক্ষ্মীকুটির আমি থাকি। ঐ বাড়ীর মালিক মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আমাকে ঐ পুস্তক পড়িতে দিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকের ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইলাম সাধনার বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়া আনন্দময়ীমাও শব্দানুভূতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করানন্দ ব্রহ্মচারীর ঐ প্রকার শ্লেষব্যঞ্জক উক্তি হইতে আমার মনে হয় এই সম্পর্কে তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিলে তিনি কখনো উহা বলিতেন না। সে যাহা হউক, মার মধুর হাসিপূর্ণ প্রফুল্ল মুখখানা দেখিলেই যে প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে—ইহা যথার্থ। কথাবার্ত্তা, চাহনি প্রতিটি হাবভাব হইতে এই সাড়া পাইলাম—বাস্তবে মা আনন্দময়ীই। মার কাছে যতক্ষণ ছিলাম বেশ আনন্দেই।

সুভড্যা—

এই গ্রাম ঢাকা টাউনের দক্ষিণে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে। সহর হইতে গুদারা নৌকায় নদী পার হইয়া যাইতে হয়। সুভড্যা ডাঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দাসের বসতবাড়ী। তিনি যখন ঢাকা-মিডফোর্ড মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র সেই সময়ে ডাঃ সতীশচন্দ্র খাঁ ঐ স্কুলের শিক্ষক। সতীশদাও সৎসঙ্গী। তাহার নিকট হইতেই ব্রজেনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাত হয়। ইহার পরেই সে আশ্রমে গিয়া দীক্ষা নিয়া আসে। ডাঃ সতীশ খাঁর পিতাও সৎসঙ্গী। তিনিও শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন পরম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন; ইষ্ট-সঙ্গ উদ্দেশ্যে তিনি বহুদিন হিমাইতপুর আশ্রমে ছিলেন। আমরা যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তখন অতিবৃদ্ধ—বয়স পচাশীর উর্দ্ধে। পুরাতন সৎসঙ্গীগণ তাঁহাকে সকলেই "বুড়ো বাবা" এই সম্মানসূচক সম্বোধন করিত। এই বৃদ্ধ সৎসঙ্গী প্রায় শতায়ুঃ হইয়া বেলেঘাটা নিজ বাড়ীতে দেহ ত্যাগ করেন। ডাঃ সতীশ খাঁও এখন প্রায় পিতার বয়স পাইয়া জীবিত আছেন। ডাঃ ব্রজেন্দ্র কুমার দাস সম্পর্কে পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই তিনি স্ব-গ্রামে চিকিৎসা আরম্ভ করেন। দেশে চিকিৎসার করার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল—সেবার ভিতর দিয়া পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা। শেষকালে এই উপায়েই তিনি নিজ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বহু সংখ্যক সৎসঙ্গী করার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ডাঃ ব্রজেনদার বাড়ীতেই মাঝে মাঝে অধিবেশন হইত। তদুপলক্ষে প্রতিবেশীদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া যাজন করা হইত। সেই সময়ে প্রচার উদ্দেশ্যে যে কেহ ঐ অঞ্চলে আসিতেন ব্রজেনদার বাড়ীতেই তাহাদের থাকার একমাত্র স্থান ছিল। সুভড্যা গ্রামে আগাগোড়া সৎসঙ্গের অধিবেশন ব্রজেনদার বাড়ীতেই হইত। সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পরে মেয়েছেলেদের যোগদানের সুবিধার জন্য পাড়ায় পাড়ায়ও অধিবেশন চলিয়াছিল। এইভাবে সৎসঙ্গ

ব্রজকিশোর সাহা, ললিতমোহন ঘোষ, গৌসাইদাস কর্ম্মকার, দীঘিরপার শিবচরণ ঘোষ ও অবিনাশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির বাড়ীতে প্রতি সপ্তাহে পালাঅনুসারে নিয়মিতভাবে হইত। ললিতদা ও তাহার স্ত্রী আগেই আমার কাছে ব্রহ্মদেশে থাকাকালে মোগং সহরে "নাম" নিয়াছিল। উহারা দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে উহাদের আন্তরিকতায় সৎসঙ্গের ভাবধারা ঐ গ্রামে আরও বিস্তার লাভ করে। কোন সময়ে কোন প্রচারক তথায় উপস্থিত হইলেই তাহাকে ললিতদা ও তাহার স্ত্রী অতিশয় আপ্যায়নের সহিত গ্রহণ করিতেন। অবস্থা সচ্ছল ছিল না বটে, ইষ্টানুগটান ও তদনুগ প্রেরণাই ছিল তাহাদের একমাত্র সম্বল। ললিতদা দীক্ষা লওয়ার কিছুকাল পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে হিমাইপুর আশ্রমেও গিয়াছিলেন। পাকিস্থান হওয়ার পরে ঐ পরিবার বেহালা চলিয়া আসে। দুই বৎসর গত হইল ললিতদা দেহত্যাগ করিয়াছেন। ডাঃ ব্রজেনদা সম্পর্কে যে কথা হইতেছিল—তাহার এই এক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যখন যে কাজে হাত দিয়া থাকেন তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়েন না। ডাক্তারির মধ্যদিয়াও তাহার যথেষ্ট সেবাবুদ্ধি থাকার দরুন তথায় অনেকেই সেই গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট হইতে "নাম" নিয়াছিল। সহ-প্রতিঋত্বিক হইয়া তিনি দীর্ঘ কয়েক বৎসর আমার সাথে কাজ করিয়াছেন। যে সময় আমি ব্রহ্মদেশে যাজনে ব্যাপৃত ছিলাম তদন্তবর্ত্তীকালে ব্রজগোপাল দত্ত রায়, রত্নেশ্বর দাশশর্ম্মা, অনন্তকুমার চাটার্জি ও কানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ঋত্বিকগণও সুভড্যা গিয়া কাথা করিতেন। ব্রজেনদার বাড়ীতেই ছিল সকলের খাওয়ার ও থাকার স্থান। গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর হইতে ব্রজেনদার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঢাকার বড় রায়ট যে সময়ে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে সেই সময়ে সুভড্যার অবস্থাও অতিশয় সঙ্গিন। গ্রামবাসীদিগকে নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যে ব্রজেনদা ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রের নিকট অনেক দরবার করিয়া সুভড্যা পুলিশবাহিনী আনার ব্যবস্থা করেন।

পুলিশ যখন আক্রমণকারীদিগের উপর গুলী চালাইতে উদ্যত হয় ঠিক সেই সময়েই ব্রজেনদা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া দাঁড়ায়, সেই মুহূর্ত্তেই গুলী আসিয়া তাহার গাল ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। ঐ আঘাতেই তাহার কয়েকটি দন্ত ছুটিয়া গিয়াছিল। মনে করিতে হইবে পরমপিতার অসীম দয়ায় ঐ আঘাতের উপর দিয়াই তিনি আসন্ন মরণ হইতে বাঁচিয়া গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে যে সময়ে হিমাইতপুর আশ্রমের জন্য জমি সংগ্রহ করা হইতেছিল তৎকালে চাষের জন্য বহু উৎকৃষ্ট বলদ ও লাঙ্গলের প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রীতি উদ্দেশ্যে সেই সময়ে ব্রজেনদা নিজ অর্থে কয়েকটি বলিষ্ঠ বলদ ও উন্নত ধরণের কয়েকখানা লাঙ্গল খরিদ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমস্ত খরিদ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলেন না। অধিকন্তু ঐ সমস্ত বলদ যাহাতে নিরাপদে আশ্রমে পৌছিতে পারে সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ব্রজেনদা নিজে বলদচালকদের সাথে থাকিয়া সুভড্যা হইতে হিমাইতপুর আশ্রম পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ হাটিয়া আসিয়াছিলেন। তখন তিনি ইষ্ট—স্বার্থে এতই নিবিষ্ট ছিলেন, যে পথের কোন কষ্টই তাহাকে ম্লান করিতে পারে নাই। পাকিস্থান সৃষ্ট হওয়ার পরেই ব্রজেনদা সুভড্যা হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। সুভড্যার অন্যান্য সৎসঙ্গীগণ ও যাহার যেখানে সুবিধা হইয়াছে তথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রতিনিধিনায়ক মহাশয়ের ঢাকা সফরকালে ব্রজেনদা তাঁহাদের খাওয়া ও থাকার অনেক দায়িত্ব নিয়াছিলেন।

টঙ্গিবাড়ী—বিক্রমপুর পরগণা মধ্যে টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত ধামারণ, বরুলিয়া, সুয়াপাড়া মালিয়াল, বেলুয়া, পূর্ব্বশিমুলিয়া ও রাউৎভোগ প্রভৃতি গ্রামে সৎসঙ্গীদের ভাবধারা এক সময়ে বিপুল বিস্তার লাভ করে। রাসের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আমি ও ইন্দুহরণদা (মুখার্জি) উভয়ে ১৩২৯ সনের কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ দিয়া ধামারণ মোহিণীমোহন

শাস্ত্রীর বাড়িতে গিয়াছিলাম। বিশ্বগুরু উৎসবের কিছুদিন পরে মোহিনীদা কার্য্যোপলক্ষে কুষ্টিয়া গিয়াছিলেন, সেই সময়েই তিনি এই "সৎনাম" গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর কুষ্টিয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়া তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এবিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার লিখিত "জননী মনোমোহিনী ও শ্রীশ্রীঠাকুর" পুস্তকে আছে। সঙ্ঘভ্রাতা মনে করিয়াই মোহিনীদা আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আর আমরাও সেই ভাব হইতে তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। প্রকৃত পক্ষে তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য হইল—যাজন।

উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া গ্রামবাসী, পাড়াপড়শী ও নানা স্থান হইতে আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব অনেকেই আসিয়া থাকে সুতরাং একযোগে বহুলোক পাওয়া যাইবে, তাহাদের নিয়া আলোচনা করাও সহজ হইবে, তৎসঙ্গে ভাবের আদান প্রদানের এক সুযোগও পাওয়া যাইবে—এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই আমরা আমন্ত্রণ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলাম। কার্যতঃ তাহাই হইয়াছিল। ঐ উপলক্ষে তথায় গিয়া যাজনের ফলে অনেকেই "নাম" গ্রহণ করিয়াছিল। ঐ সময়েই মোহিনীদা তাহাদের বাড়ীতে প্রতিবৎসর রাসোৎসব উপলক্ষে উপস্থিত থাকার জন্য আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিলেন এবং কোন কারণে যেন ভুলিয়া না যাই তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াও দিলেন। একাদিক্রমে কয়েকবৎসরই আমি ও ইন্দুহরণদা এই রাসোৎসব উপলক্ষে মোহিনীদার বাড়ীতে গিয়াছিলাম। মোহিনীদার পিতা কৃষ্ণধন বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন জীবিত। কর-কোষ্ঠি বিচার সম্পর্কে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। দেব-দ্বিজ-বিগ্রহাদির প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। পারিপার্শ্বিকদের খাওয়ান-দাওয়ান ও সেবা তাঁহার এক প্রধান করণীয় ছিল। অতিথি-অভ্যাগত ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে অন্তরের সহিত তিনি গ্রহণ করিতেন। যদিও তিনি ভিন্ন-পন্থী ছিলেন তথাপি আমাদের প্রতি বুদ্ধের শ্রদ্ধা যথেষ্ট

ছিল। যখনই যাইতাম আমাদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে সকল কথা অতিশয় আগ্রহের সহিত শুনিতেন। রাস উপলক্ষে মোহিনীদার বাড়ীতে যাওয়া-আসার দরুণ ঐ অঞ্চলে পরে স্থায়ীভাবে যাজন করার সুবিধা হইয়াছিল। ইতিকাল মধ্যে মোহিনীদার স্ত্রী, তাহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা সস্ত্রীক ও আত্মীয়-গণের মধ্যে কেহ কেহ আমার নিকট হইতে "নাম" গ্রহণ করিলেন।

ধামারণ হইতে বরুলিয়া গিয়াছিলাম। মোহিনীদার নিকট জানিতে পাইলাম বরুলিয়া নন্দীবাড়ীতে কয়েকজন সৎসঙ্গী আছেন। এই সংবাদ পাওয়ার পরেই তাহাদের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য বরুলিয়া গেলাম। ওখানে গিয়া জানিতে পারিলাম বাড়ীর কর্ত্তা প্রসন্নকুমার নন্দী সৎসঙ্গী। পশ্চাতে তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই এই "নামে" দীক্ষিত হইয়াছিল। এই বৃদ্ধ নন্দী মহাশয়ই সৎসঙ্গের ডাঃ প্যারীমোহন নন্দীর পিতা। এইস্থলে ডাঃ প্যারীদার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি—দীক্ষা নেওয়ার পর হইতেই প্যারীদা বহুকাল যাবত শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যেই আছেন। ঔষধাদি সেবন করান হইতে তামাক সাজান, গাত্রে তৈল-মর্দ্দন, স্নান করান, নখ-কর্ত্তন, অঙ্গ প্রসাধন ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক শ্রীশ্রীঠাকুরের যাবতীয় সেবা-পরিচর্য্যা তিনি স্বহস্তে করিয়া থাকেন। এই প্রকার সেবার সৌভাগ্য অনেকেরই ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। ইষ্ট-প্রীত্যর্থে প্যারীদার এই প্রকার আত্মনিয়োগ দু'চার বছরের নয়—একাদিক্রমে পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের ঊর্দ্ধে চলিয়াছে। কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে হয়, ইষ্ট-সেবার জন্যই যেন তাহার জন্ম। ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই তাহার ভাগ্যে এই শুভ ইষ্ট-সংযোগ। প্যারীদার পিতাও শ্রদ্ধাশীল অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। যখনই তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম বৃদ্ধ নন্দী মহাশয় অধিকাংশ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গ নিয়াই আমাদের সহিত অতিবাহিত করিতেন। ঐ বৃদ্ধ বাবাজীর একান্ত টানেই আমরা মাঝে মাঝে বরুলিয়া গিয়া থাকিতাম। ঐ গ্রামে নন্দী বাড়ীতেই সৎসঙ্গের অধিবেশন কেন্দ্র ছিল। ন্যূনাধিক সাত কি আট বৎসর হয় বৃদ্ধ নন্দী মহাশয় দেহ-ত্যাগ

করিয়াছেন। নন্দী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ-বাসরে আমার উপস্থিতি এক আকস্মিক ঘটনা। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন আমি ঢাকা হইতে রওনা হইয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে কমলাঘাট নামিয়া নৌকাযোগে বেলুয়া প্রাণবল্লভ পালের বাড়ীতে যাইতেছিলাম। উদ্দেশ্য—প্রাণবল্লভের বাড়ীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ঐ অঞ্চলে যাজন করা। পথিমধ্যে আগে টঙ্গীবাড়ী বন্দরে নামিয়া সৎসঙ্গী সন্তোষচন্দ্র পালের গদীতে গিয়া বসিলাম। অনন্তর কুশলাদি জিজ্ঞাসার পরে সন্তোষের সহিত আমার ঐ অঞ্চলে যাওয়া সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। এই সময়ে প্যারীদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীমোহন নন্দী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাকে দেখিয়াই কিশোরীদা বলিলেন—আপনার কথাই আমরা ভাব্‌ছিলাম, কিন্তু কোথায় আছেন নিশ্চিন্ত জানা না থাকায় আপনাকে পত্র দিতে পারি নাই; বাবা গত হয়েছেন, আগামীকল্য তাহার আদ্য-শ্রাদ্ধ, এখান হইতেই আপনাকে আমাদের বাড়ীতে যে'তে হবে।" সন্তোষ পালের গদী হইতেই আমাকে বকুলিয়া যাইতে হইল। বৃদ্ধ নন্দী মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাই দৈবাৎ এইভাবে যে তাঁহার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের সময়ে উপস্থিত ছিলাম—ইহাই হইল আমার পরম তৃপ্তির বিষয়।

টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত বেলুয়া গ্রামে প্রাণবল্লভ পালের বাড়ীতেই ছিল উক্ত অঞ্চলে যাজন করার মূল কেন্দ্র। প্রাণবল্লভের অধ্বর্য্যুর পাঞ্জা ছিল। তাহার হৃদয়গ্রাহী যাজন, অমায়িক ব্যবহার ও অনাবিল চরিত্রগুণেই তৎসময়ে ঐ অঞ্চলে অনেক দীক্ষা হইয়াছিল। এক সময়ে বেলুয়া গ্রামের আশে পাশে মারিয়াল, টঙ্গিবাড়ী, সুয়াপাড়া, বকুলিয়া, পূর্ব্বশিমুলিয়া প্রভৃতি স্থানে সৎসঙ্গীদের বাড়ীতে বাড়ীতে সৎসঙ্গের অধিবেশন যে ধারাবাহিক ভাবে হইতে-ছিল, তাহাও প্রাণবল্লভের ঐকান্তিক চেষ্টা ও আন্তরিক যাজনের কারণেই। উক্ত অঞ্চলে যে কোন ঋত্বিক গিয়াছেন প্রত্যেকের থাকার স্থান ছিল প্রাণবল্লভের বাড়ীতে। আর তাহার সহায়তা নিয়াই তথায় যাহাকিছু কাজ হইয়াছিল। প্রতিঋত্বিক রত্নেশ্বর দাশশর্ম্মা, প্রতিঋত্বিক ফণীভূষণ মুখার্জি, প্রতিঋত্বিক রাধিকা

মোহন ব্যানার্জি প্রভৃতির প্রধান কার্য্যস্থল এক সময়ে বেলুয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ছিল। সুয়াপাড়া হারাণচন্দ্র দাসের বাড়ীতেও সময় সময় অধিবেশন হইত। আমি নিজে হারাণচন্দ্র দাসের বাড়ীতে গিয়াছি। তাহারই যাজনে কবিরাজ পরেশচন্দ্র দাস আমার নিকট হইতে দীক্ষা নিয়াছিল। হারাণচন্দ্র দাসের ইষ্টপ্রাণতা প্রনিধানযোগ্য। বর্ত্তমানে সে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া ইষ্টার্থে সৎসঙ্গ ফিলেনথ্রপী আফিসে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। তথায় সে এখন হিসাব পরীক্ষকের পদে আছে।

লৌহজঙ্গ থানা—

লৌহজঙ্গ থানার অন্তর্গত দিঘলী বাজারে সৎসঙ্গের একটি অধিবেশন-কেন্দ্র ছিল। তথা হইতেও কয়েক বৎসর জোরে যাজন কার্য্য চলিয়াছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ রায় (সহ-প্রতিঋত্বিক) নিজের চিকিৎসাকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চালাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ছাড়িয়া দিঘলী গ্রামে চলিয়া আসেন। সেই সময়ে জিতেনদা দিঘলী বন্দরে একখানা দ্বিতল গৃহ ভাড়া নেন। উক্ত গৃহের নীচের কামরায় তাহার চেম্বার ছিল। আর উপরের কামরা সৎসঙ্গের সাপ্তাহিক অধিবেশনের জন্ত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এদিকে পদ্মার ভাঙ্গনীতে ডাঃ গোকুলবিহারী নন্দীর পৈতৃক বাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহারা কিছু পূর্ব্ব হইতেই দিঘলী চলিয়া আসিয়াছিল। ডাঃ জিতেন রায় ও ডাঃ গোকুলবিহারী নন্দী উভয়েই সম ব্যবসায়ী. অধিকন্তু গুরুভাই, তাই উঁহাদের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। ইষ্টস্বার্থী হইয়া উভয়েই একযোগে তুমুল যাজন আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে শিবরাম চক্রবর্ত্তী (বর্ত্তমানে সহ-প্রতিঋত্বিক) "নাম" গ্রহণ করাতে তখন তাহাকে একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মী পাওয়া গেল। সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে ঐ অঞ্চলে তৎসময়ে সৎসঙ্গের ভাবধারা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করে। উঁহাদের কার্য্যের সাহার্য্যার্থে আমি ও ফণীভূষণ মুখার্জি মাঝে মাঝে দিঘলী সৎসঙ্গে গিয়া থাকিতাম। উক্ত সময়ে উঁহাদের যাজনে উদ্বুদ্ধ হইয়া আশেপাশে ও গ্রামান্তরে অনেকেই দীক্ষা

নিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত দিঘলীর সৎসঙ্গের এই অধিবেশন-কেন্দ্র নিয়মিত ভাবে চলিয়াছিল। পাকিস্থান সৃষ্ট হওয়ার পরেই ডাঃ জিতেন রায় দিঘলী হইতে বর্দ্ধমান চলিয়া আসে। এই বিপাকে পড়িয়া ডাঃ গোকুলবিহারী নন্দীকেও দেশ ছাড়িয়া আসিতে হইল। ইহার পরেই ডাঃ গোকুলবিহারী নন্দী সস্ত্রীক দেওঘর চলিয়া আসে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ মতে সৎসঙ্গ মেডিক্যাল এইডে আত্মনিয়োগ করে। আর শিবরাম চক্রবর্ত্তীও তাহার শিক্ষকতার কার্য্য ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত সময়ের জন্য ইষ্টার্থমূলক যাজন কার্য্যে নিজেকে উৎসর্গ করে। যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানে গিয়া সে এখন যাজন করিয়া থাকে।

১.মহেশ্বরদি পরগণা—

উক্ত পরগণা মধ্যে মনোহরদি থানার ঘোষগাও আর আমুদপুর এই দুই স্থান এই ইতিবৃত্তে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উক্ত অঞ্চল মধ্যে সর্ব্বাগ্রে ঘোষগাও হইতেই সর্ব্বত্র যাজন ক্ষেত্রের প্রস্তুতি, আর আমুদপুর গ্রামেই সর্ব্বপ্রথম নিজস্ব ভূমিতে শাখা সৎসঙ্গের উদ্বোধন। তাই এই দুই স্থান বিশেষ স্মরণীয় এবং এই ইতিবৃত্তের প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

৺শ্যামাপূজা উপলক্ষে ১৩৪৭ সনের কার্ত্তিক মাসে আমি আমন্ত্রিত হইয়া বক্তারপুর সৎসঙ্গী প্রফুল্লকুমার নাগের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। ব্রহ্মদেশে থাকা কালে প্রফুল্লদা ও তাহার স্ত্রী আমার নিকট হইতে "নাম" নিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কাথা সরকারী হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। উহাদের দীক্ষার পরে উক্ত পরিবারের আরো কয়েকজন এই দীক্ষা নিয়াছিলেন। কথিত সময়ে প্রফুল্লদা দেশেই ছিলেন। যুদ্ধের জন্য আগেই ব্রহ্মদেশ হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন। বাড়ীতে শ্যামাপূজা—এই উপলক্ষে আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধু-বান্ধব অনেকেরই সমাগম হইবে, আর সেই সুযোগে তাহাদের মধ্যে যাজনও চলিবে, এই মনে করিয়াই ঐ পূজা উপলক্ষে বক্তারপুর যাওয়া হইল। ওখানে যাওয়াতে প্রকৃতপক্ষে মহেশ্বরদি পরগণায় ব্যাপকভাবে যাজন করার এক অভাবনীয় সুযোগ সংঘটিত হইল। নাগ পরিবারের এক জামাতাও পূজা

উপলক্ষে আসিয়াছিল। তাহার নাম কেদারনাথ দাস—বাড়ী ঘোষগাও। জানিতে পারিলাম, সে গ্রাজুয়েট, হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক, বাড়ীতে থাকিয়াই স্কুলে কাজ করে। কেদারনাথই উল্লিখিত সুযোগের একমাত্র কারণ। তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়ার পরেই "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" বইখানা তাহাকে পড়িতে দিলাম। দুইদিন পরেই কেদারনাথ বইখানা ফেরত দিল। ঐসঙ্গে ইহাও প্রকাশ করিল—আগাগোড়া বই সে পড়িয়াছে, খুব ভালই লাগিয়াছে। ইহার পরেই কেদারনাথ তাহার সাথে আমাকে ঘোষগাও নিয়া যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কেবল ইচ্ছাও নয়—তৎসঙ্গে ব্যগ্রতার সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল। ঢাকাতে বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া কেদারনাথের এই অনুরোধ তখন রক্ষা করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলাম—ঢাকা হইতে যত সত্বর সম্ভব ঘোষগাও যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। ইহার দুই তিন দিন পরেই আমি ঢাকা চলিয়া আসিলাম, আর কেদারনাথও বক্তারপুর হইতে ঘোষগাও চলিয়া গেল।

ঢাকাতে পৌঁছার কয়েকদিন পরেই আমি কেদারনাথকে পত্র দিয়া জানাইলাম তাহার উত্তর পাইলেই ঘোষগাও রওনা হইব। ফেরত ডাকেই সেই উত্তর পাওয়া গেল। তাহার লেখা অনুসারে আমি ঢাকা হইতে ভৈরব লাইনে দৌলতকান্দি ষ্টেশনে নামিলাম এবং তথা হইতে নৌকাযোগে বেলাবো গেলাম। সেখানে আমার প্রতীক্ষায় লোক ছিল। তাহার সাথে চন্দনপুর পালদের বাড়ীতে আসিলাম। ঢাকা জেলার মধ্যে বেলাবো একটি প্রয়োজনীয় কারবার স্থল। এই বন্দরে তৈয়ারী কাঠালের তক্তার বৃহৎ বৃহৎ পিঁড়ী, চৌকি, চেয়ার, টেবিল, আলমারী বহু প্রকারের জিনিষ পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত আসবাবের জন্যই এইস্থান সুপ্রসিদ্ধ। চন্দনপুর বেলাবোর পশাপাশি গ্রাম। ডাঃ বিপিন চন্দ্র পালের বাড়ী ঐ গ্রামেই। তাহার বাড়ীতেই গিয়া আমি প্রথম উঠিয়াছিলাম। ডাক্তারবাবু পাইকপাড়ার যতীন্দ্রমোহন দাসের ভায়রা ভাই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যতীনদা চট্টগ্রাম টাউনে আমার নিকট হইতে দীক্

নিয়াছিলেন। সেই সম্পর্কেই ঐ বাড়ীতে যাওয়া। যতীনদাও এ বিষয়ে বিপিনবাবুকে আগেই পত্র দিয়া জানাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমিও রওনা হওয়ার পূর্ব্বে ডাক্তারবাবুকে পৃথক পত্রদ্বারা তথায় আমার যাওয়ার দিন—পৌছার সময় ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ জানাইয়া রাখিয়াছিলাম। তদনুসারে ডাক্তারবাবু তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীরকে বেলাবো পাঠাইয়াছিলেন। তাহার সাথে আমি চন্দনপুর আসিয়াছিলাম। সুধীর এই উপলক্ষে আমার নিকট হইতে "নাম"ও নিয়াছিল।

বেলাবো হইতে চন্দনপুর প্রায় এগারটায় পৌছিলাম। বেলা হইয়াছিল, তাই গিয়াই আগে স্নান সারিয়া পরে রান্না করিতে পাক-শালায় গেলাম। সেখানে গিয়া প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা দেখিলাম। তাহাতেই প্রায় মধ্যাহ্ন ভোজনের কাজ হইয়া গেল। অতঃপর ডাক্তারবাবুর বৃদ্ধা মা তৎপরতার সহিত রান্নার সব আয়োজন করিয়া দিলেন! আহার করিবার সময়ে বৃদ্ধা-মা আগাগোড়া সম্মুখে থাকিয়া সমস্ত তদ্বির করিলেন। তিনি যেরূপ আন্তরিকতা ও আদর আপ্যায়নের সহিত আহার করাইলেন, তাহা আহারের চেয়েও অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ। প্রাচীনা গৃহিণীদের অতিথি সেবার জীবন্ত দৃশ্য এই বৃদ্ধা মহিলার মধ্যে দেখিতে পাইলাম। আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিতেই তিনটা বাজিল। এমন সময়ে আমাকে নেওয়ার জন্য ঘোষগাও হইতে লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। এক ঘণ্টা বিশ্রামের পরে বেলা চারিটায় আমরা রওনা হইলাম। কোন প্রকার যান-বাহনে যাওয়ার উপায় ছিল না, তাই পদব্রজেই যাইতে হইল। চন্দনপুর হইতে ঘোষগাও পুরা পাঁচ মাইল ব্যবধান। লোক সাথে ছিল তাই কথাবার্ত্তা আলোচনার মধ্য দিয়া চলিতে থাকায় এতদূর পথ হাটিয়া যাইতেও বিশেষ কষ্ট বোধ করিলাম না। সতীশ চন্দ্র দাস আমাকে নিতে আসিয়াছিল। দীক্ষা নেওয়ার পরে সতীশ দাস পূর্ণ এক বৎসরকাল আশ্রমে ছিল। আনন্দবাজারের সেবা কার্য্যেই সে তখন আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। আমরা সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে ঘোষগাও পৌছিলাম।

রাত্রিতে গ্রামবাসী অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইল। মাষ্টার কেদারনাথ সকলের নিকট আমার পরিচয় দিলেন। অনন্তর উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি যে প্রশ্ন করিলেন তাহার উত্তর চলিতে থাকিল। প্রশ্নকর্ত্তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন জয়কুমার দাস আর মাষ্টার কেদারনাথ দাস। রাত্রি অধিক হইলে পরে যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন। অহারান্তে আমিও শুইয়া পড়িলাম। ভোর হওয়ার পূর্ব্বেই জয়কুমার দাস আসিয়া আমার শয়নঘরে উপস্থিত হইলেন। আর তক্ষণই দীক্ষা নিবেন—এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহাকে দক্ষিণা ও প্রণামীর বিষয় জানান হইল। তদুত্তরে তিনি বলিলেন—এক্ষণে দক্ষিণা বা প্রণামী কিছুই না, ফল দেখিয়া পশ্চাতে যাহা সাধ্য দিবেন, এখন শুধু "নাম" চাহিতেছেন। আমিও তাহাকে জানাইয়া দিলাম—দক্ষিণা বা প্রণামী ব্যতীত দীক্ষা হইবে না, যাহা নির্দ্দেশ আছে তাহা মানিতেই হইবে, তবে পরিমান কম আর বেশী—যার যেমন সাধ্য, কিন্তু নিয়মের ব্যতিক্রম কিছুতেই হইবে না। তখন তিনি বলিলেন—দক্ষিণা এক পয়সা আর প্রণামী এক পয়সা দিব। তাহা দিয়াই দীক্ষা নিতে হইবে। —ইহা আমি স্বীকার করিলাম। নিয়ম রক্ষার্থে ঐ প্রণামী আর ঐ দক্ষিণা নিয়াই তখন তাহাকে দীক্ষা দেওয়া হইল। এইস্থলে আগ্রহাতিশয্যই উহার "নাম" পাওয়ার একমাত্র কারণ। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, দীক্ষান্তে জয়কুমারদা জানাইলেন, এক্ষণই তাহাকে সাধারচর তাহার ভগ্নীর বাড়ীতে চলিয়া যাইতে হইবে, ভগ্নী অতিশয় কঠিন রোগে আক্রান্ত, তাহার অবস্থা নিতান্ত নৈরাশ্যপূর্ণ। অতঃপর তিনি আমার নিকট যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসার কথা আমি তাহাকে বলিয়া দিলাম। ঘোষগাও হইতে সাধারচর কমপক্ষে দশ মাইল ব্যবধান। এতদূর পথ হাঁটিয়া গিয়াও জয়কুমারদা সন্ধ্যার পরক্ষণেই বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী পৌছার পরেই আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। তখন ইহাও প্রকাশ করিলেন যতদিন পর্য্যন্ত আপনি এখানে আছেন ততদিন দূরে কোথাও যাইবে

বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্র

না, কাছে থাকিয়াই আমার সঙ্গ করিবেন। একদিনেই এত অধিক আকৃষ্ট দেখিয়া আমিও মুগ্ধ হইলাম। দীক্ষার পর হইতেই জয়কুমারদা আমার যাজনের সাথী হইয়া স্থানে স্থানে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইভাবে আত্ম-নিয়োগের ফলে অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কি যথাবিধি ছয়ত্রিশ দিন প্রাজাপত্য করিয়া অনতিবিলম্বে আশ্রমে গিয়া তিনি উপবীতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সহ-প্রতিঋত্বিকের পাঞ্জাও পাইয়াছিলেন। হিমাইতপুর আশ্রমে কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে জমির জন্য যখন অর্থ সংগ্রহ হইতে থাকে তৎকালে তিনি এককালীন তিনশত টাকা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে অর্ঘ্যস্বরূপ দিয়াছিলেন।

জয়কুমারদা ১৩৪৮ সনের চৈত্র মাসের ঋত্বিক-অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই উপবীত গ্রহণ করেন। এইজন্য ঐ সম্মিলনীর কয়েকদিন পূর্ব্বেই তাহাকে আশ্রমে আসিতে হইল। তিনি তখন ময়মনসিংহ লাইনে সিরাজগঞ্জ হইয়া হিমাইতপুর আসিতেছিলেন। ঐ সময়ে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। তাহার সাথে আমুদপুরের যামিনীবন্ধু চক্রবর্ত্তী, রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তী, চালাকচরের নরেন্দ্রনাথ দেব কবিরাজ, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় দাস—তৎকালে সব-রেজিষ্ট্রার মনোহরদি, যোষগাঁওর সতীশচন্দ্র দাস, প্রতাপচন্দ্র দাস প্রভৃতি ছিলেন। আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। জগন্নাথঘাট হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাটে নামিবার সময়ে জয়কুমারদার সমস্ত টাকা পকেট হইতে চুরি হইয়া যায়। সিরাজগঞ্জ রেল ষ্টেশনে টিকেট করিতে গিয়া তিনি তাহার এই অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তখনই অন্যান্য সাথীদের নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া টিকেট কিনিয়া লইলেন। এদিকে চোর পুলিশের হাতে ধরা পড়িল। পুলিশ তখনই কাহার টাকা চুরি গিয়াছে জানিবার জন্য ট্রেনের বিভিন্ন কামরায় আসিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকে। শেষকালে আমাদের কামরায় উপস্থিত হইলে আমরা জয়কুমারদার কথা বলিলাম। পুলিশ জয়কুমারদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিলেন মোট টাকার পরিমাণ কত এবং কি কি হারানি

গিয়াছে। সেই সময়ে জয়কুমারদার স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। কয়খানা নোট, কোনখানি কত মূল্যের, কত গোটা টাকা, খুচরা আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি ও পয়সা কত একবারে হুবাহুব তিনি বলিয়া ফেলিলেন। বলা বাহুল্য, পুলিশ চোরের নিকট হইতে তাহাই পাইয়াছিল। সিরাজগঞ্জ কোর্টে এই মোকদ্দমা কয়েকমাস চলিয়াছিল। এইজন্য সাক্ষ্য দিতে ক্ষিতীশদা ও জয়কুমারদাকে কয়েকবার সিরাজগঞ্জ যাইতে হইয়াছিল। এই ঘটনা তাহাদের পক্ষে শাপে বর হইয়া গেল। জয়কুমারদা তাহার সম্পূর্ণ টাকা মায় যাতায়াত খরচাসহ পাইলেন; আর ক্ষিতীশদাও তাহার যাতায়াতের সম্পূর্ণ খরচা পাইয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জ যাতায়াতের এই সুযোগে প্রত্যেকবারই আশ্রমে গিয়া তাহাদের শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

ঘোষগাও সম্পর্কে যাহা বলিতেছিলাম—কার্ত্তিক মাসের ২৮শে তারিখে তথায় গিয়াছিলাম। দুইদিন ক্রমাগত আলোচনার পরেই ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে প্রতাপ দাস সস্ত্রীক ও তাহার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা সস্ত্রীক দীক্ষা নিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে কেদারনাথ দাস, তাহার স্ত্রী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র দাস সস্ত্রীক, জয়কুমার দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রকুমার দাস, জয়কুমার দাসের স্ত্রী, হরেন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং প্রতিবেশী আরও অনেকে দীক্ষা লইল। তখন হইতেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রতাপচন্দ্র দাসের বাড়ীতে সম্মিলিত বিনতি-প্রার্থনা হইতে থাকিল। এদিকে ওখানে কয়েকদিন থাকার ফলে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে লোকজন আসিয়া আমার সাথে দেখা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সহিত পরিচিত হইয়া সেই সূত্রে আমিও প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়া ভালমন্দ জিজ্ঞাসা উপলক্ষে মিলামিশা করিতে থাকিলাম। ইহাতে অনেকেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হইল। আর ঘন ঘন যাজন করার দরুন ক্রমে "নামও" নিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘোষগাঁও, মির্জ্জাপুর, চালকচর, আমুদপুর, নরেন্দ্রপুর, খারাবো, চন্দনপুর প্রভৃতি গ্রামে সৎসঙ্গের ভাবধারা বিশেষ বিস্তার লাভ করিল। আর প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনা

ও প্রতি প্রত্যেকে ডাকিয়া আনিয়া প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় সমবেত—বিনতি প্রার্থনা করার দরুণ অত্যল্পকাল মধ্যে প্রত্যেকেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল।

এইভাবে তথায় সৎসঙ্গীদের সাথে দিবারাত্র খুব আনন্দেই চলিতেছিলাম। তন্মধ্যে এক মহা-সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। জয়কুমার দাসের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক নাম হরি, বয়স দশ বৎসরের অনধিক, শিশুকালে মাতৃহীন হওয়ায় জয়কুমারদার স্ত্রীই উহাকে লালনপালন করিতেছে। দুই দিন পূর্ব্বে সেই বালকটির জ্বর হইয়াছিল। অকস্মাৎ তাহার অবস্থা অতিশয় নৈরাশ্য পূর্ণ হইয়া উঠিল—জীবন যায় যায়। সেইদিন সৎসঙ্গী হরেন্দ্রকুমার নন্দীর বাড়ীতে আমার মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিজেই রান্না করিতেছিলাম, ডাল, তরকারী রান্না আগেই হইয়াছিল। ভাতের মাড় গালা হইতেছে, এমন সময়ে উপর্য্যুপরি দুই ব্যক্তি আসিয়া ঐ ছেলেটির বিপদের অবস্থা আমাকে জানাইল। আমিও তাড়াতাড়ি মাড়গালা শেষ করিয়া তখনই জয়কুমার দাসের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। দেখিলাম বালকটির অবস্থা অতীব মুমূর্ষু—ঘন ঘন শ্বাস হইতেছে, কণ্ঠ শ্লেষ্মাদ্বারা অবরুদ্ধ, নেত্রদ্বয় উর্দ্ধদিকে উঠিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই ছেলেটীর পিতা ও পালিকা জয়কুমার দাসের স্ত্রী অধীর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি চেষ্টা করিলেই ছেলেটী যে রক্ষা পাইতে পারে এই উক্তিও আবেগভরে তাহারা পুন: পুনঃ করিতে থাকিল। দাঁড়ান অবস্থায় আমি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। এই সময় আবার জয়কুমার দাস অতিশয় কাতরতার সহিত বলিলেন—"আপনি স্পর্শ করিয়া "নাম" করিলেই হরি শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় রক্ষা পাইবে"। উপস্থিত অন্যান্য সকলেও এই উক্তির সমর্থন করিল। আমিও দিশা না পাইয়া ছেলেটির মস্তক স্পর্শ করিয়া মনে মনে অনবরত "নাম" করিতে লাগিলাম আর পরমপিতার নিকট এই প্রার্থনা করিলাম—আমি উপলক্ষমাত্র ঠাকুর! তোমার যাহা ইচ্ছা

তাহাই হবে; ইহাদের তোমার প্রতি নির্ভরতা আর তোমার প্রতি আমার নির্ভরতা এই স্থলে একমাত্র ভরসা। এই প্রকার প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ বমনোদ্রেক হইয়া বালকটীর নাক-মুখ দিয়া অনর্গল শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকিল। এই প্রকার দুই তিন মিনিট কাল শ্লেষ্মা নিঃসরণের পরেই আপনা হইতে শ্বাসকষ্ট কমিয়া গেল, চক্ষু স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল। হঠাৎ ভালর দিকে এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখিয়া নানা জন নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিতে থাকিলেন। আমার কিন্তু ধারণা নিজের কৃতিত্ব এখানে কিছুই নাই—উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হেতু "নাম" করার ফলেই যাহা কিছু হইয়া ছিল।

ঘোষগাঁও সংলগ্ন পশ্চিমদিকে মির্জ্জাপুর গ্রাম। তথায় প্রতাপদাসের এক পিসিমাতার বাড়ী। তিনি বিধবা। সংসারের মধ্যে একমাত্র পুত্রবধু—সেও বিধবা এবং নিঃসন্তান। পুত্রবধূ "নাম" নিয়াছিল। তাই বেড়ানো উপলক্ষে একদিন সকালে সেই বাড়ীতে গেলাম। সতীশ আমার সঙ্গে ছিল। সতীশদের বাড়ী হইতে ঐ পিসিমার বাড়ী দুইশত গজ ব্যবধানের অধিক হইবে না। বৃদ্ধার অবস্থা ভালই ছিল। জমিজমা প্রচুর তাই খাওয়া পড়ার কোন অভাব ছিল না; বেশ স্বচ্ছন্দেই চলে। উহার ঘরের বারান্দায় বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিষয়ে নানা কথা বলিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা মা আমাকে ডাকিয়া গৃহ মধ্যে নিয়া গেলেন, আর অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া একটী ডোল দেখাইয়া বলিলেন—আমার এই চাউল কোন সৎকার্য্যে ব্যয় হউক, এই আমার ইচ্ছা। বলার সাথে সাথে বৃদ্ধামার এত আগ্রহ উপস্থিত হইল, তিনি ভাবাপন্ন হইয়া আমার হাতখানি ধরিয়া ঐ ডোলে স্পর্শ করাইলেন। তন্মুহুর্ত্তে আমি বলিলাম, এই চাউলের সৎব্যবহারই হবে। আজ বিকালে এই সম্বন্ধে খবর পাইবেন। সতীশও আমার পার্শ্বে দাঁড়ান ছিল। সেও আমার মতে মত প্রকাশ করিল। অনুমান করিলাম ডোলটিতে প্রায় চারিমণ চাউল আছে।

অতঃপর বৃন্দামার বাড়ী হইতে ঘোষগাঁও ফিরিলাম। তখনই জয়কুমার দাস, প্রতাপ দাস, কেদার দাস ও সতীশ দাস প্রভৃতিকে নিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করা হইল। তাহারা সকলেই এই সম্পর্কে সমাধানের ভার আমার উপর দিলেন। আমিও আমার মত তাহাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। তাহাতে এই স্থির হইল—সৎসঙ্গীদের লইয়া একটি উৎসব হইবে, আর তদুপলক্ষে ঐ চাউল ব্যয় হইবে। তখনই পঞ্জিকা দেখিয়া দিন—তারিখ স্থির হইল। ফাল্গুন মাসে উৎসবের দিন ধার্য্য করা হইল।

ইতিমধ্যে জয়কুমার দাস, প্রতাপদাস, কেদার দাস ও তাহাদের পরিবারের কোন কোন বধূ, চালাকচরের নরেন্দ্রনাথ দেব কবিরাজ একযোগে হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়া আসিলেন। ঐ সময়ে আমাকেও তাহাদের সাথে যাইতে হইয়াছিল। আশ্রমে আলাপ-আলোচনায় শ্রদ্ধেয় ব্রজেনদার (চ্যাটার্জ্জী) সহিত উঁহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। সেই সময়ে পরিকল্পিত উৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য ব্রজেনদাকে উঁহারা আমন্ত্রণ করিয়া আসেন। ব্রজেনদাও স্বীকৃতি দিয়া দিলেন। ঘোষগাঁওর এই উৎসব ১৩৪৭ সনের ফাল্গুন মাসে হইয়াছিল। অনুষ্ঠান ১৬ই ফাল্গুন হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত তিনদিন ক্রমান্বয়ে চলিয়াছিল। প্রতিদিনই ভোগারতি, বিনতি-প্রার্থনা, প্রসাদ বিতরণ, বক্তৃতা-আলোচনা হইত। প্রতিশ্রুতি অনুসারে ব্রজেনদাও ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবের পরে ঐ গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহুলোকই "নাম" নিয়াছিল। সহ প্রতিঋত্বিক ক্ষিতীশচন্দ্র রায়দাস, তৎসময়ে মনোহরদি সবরেজিষ্ট্রার। তিনিও সপরিবারে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসব যাহাতে সর্ব্বদিক দিয়া সার্থক হয় এই উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান আরম্ভ অবধি শেষ পর্য্যন্ত তিনি ঘোষগাঁও ছিলেন। উৎসবান্তে তাহার বাসায় এক প্রীতি-ভোজও হইয়াছিল। সমাগত সমস্ত সৎসঙ্গীগণ এই ভোজ-উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ঘোষগাঁও হইতে সকলে মিলিতভাবে "পতিত

পাবন নাম রাধা বল” খোল করতাল সহ সমগ্র পথে তুমুল কীর্ত্তন ও মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে “বন্দে পুরুষোত্তমম্” ধ্বনিত করিয়া মনোহরদি তাহার বাসা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। রাত্রিতে বিনতি-প্রার্থনা, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও ভোগারতির পরে প্রসাদ গ্রহণান্তে অন্যান্য সকলে ঘোষগাও চলিয়া আসিল। আমি আর ব্রজেনদা রাত্রিতে ঐ বাসায় রহিলাম। পরদিন ওখান হইতে রওনা হইয়া আমি ঢাকা আসিলাম, আর ব্রজেনদা আশ্রমে চলিয়া গেলেন। ঘোষগাও সৎসঙ্ঘ—অধিবেশনকেন্দ্রে দ্বিতীয় উৎসব ১৩৪৮ সনের ফাল্গুন মাসের মধ্যভাগ দিয়া হইয়াছিল। উহাও ক্রমাগত তিনদিন ব্যাপিয়া চলিয়াছিল। এই উৎসব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে হিমাইতপুর হইতে শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র হালদার এম-এ বি-এল, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এস, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। এই উৎসবের পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার আমার উপর ছিল। ওখানে যে সমস্ত কর্ম্মী আমাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের একটা বৈশিষ্ট্য দেখিলাম, যখনই যাহাকে যে কোন কার্য্যের জন্য নির্দ্দেশ করা হইত, তখনই সে বিনাবাক্য ব্যয়ে তৎপরতার সহিত নিজ কর্ত্তব্য পালন করিত। এই কারণে কর্ম্মসূচী অনুসারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় উৎসবের প্রত্যেকটি অঙ্গ সুনিষ্পন্ন হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে প্রতিবিষয়ে সময়ানুবর্ত্তিতা ও প্রতিকার্য্যে কর্ম্মীদের তৎপরতা লক্ষ্য করিয়া শরৎদা অতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন প্রাতে মঙ্গলাচরণ, মধ্যাহ্নে ভোগ-উৎসর্গ, তৎপরে প্রসাদ বিতরণ, অপরাহ্নে বক্তৃতা, তৎপরে আলোচনা, সন্ধ্যায় বিনতি—প্রার্থনা, তৎপর প্রশ্নোত্তর এবং সর্ব্বশেষে কীর্ত্তন নিয়মিতভাবে চলিয়াছিল। শরৎদার আবেগময়ী ভাব-ভাষা পরিপূর্ণ, ওজস্বিনী বক্তৃতায়, শৈলেন্দ্র নাথ ও কিরণ চন্দ্রের সুমধুর কীর্ত্তনে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। উল্লিখিত দিবসত্রয়

ঘোষগাঁও যেন আনন্দে মুখরিত হইয়াছিল। উৎসবের পরেও শরৎদা প্রভৃতি কয়েকদিন ছিলেন। এই ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের মধ্যে একটা প্রেরণা অনেকদিন পর্য্যন্ত যে চলিয়াছিল, তাহা লোকজনের পথেঘাটে পরস্পর আলাপ আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইত।

আমুদপুর—

আমুদপুর গ্রাম সৎসঙ্গীদের বিশেষ স্মরণযোগ্য স্থান। এখানেই নিজস্ব ভূমিতে শাখ-সৎসঙ্গের সর্ব্বপ্রথম উদ্বোধন। তথাকার সৎসঙ্গী যামিনীবন্ধু চক্রবর্ত্তী এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বাগ্রে জমি দান করেন। নিম্নে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। ঐ অঞ্চলে সৎসঙ্গী সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাহাদিগকে উদ্দীপিত রাখার জন্য আমাকে মাঝে মাঝে ঘোষগাঁও যাইতে হইত এবং ঐ স্থান কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় স্থানে যাজনকার্য্যও চালাইতে হইত। এই প্রকারে যাজন-নিরত থাকা অবস্থায় একদিন আমি ও জয়কুমারদা এই পরামর্শ করিয়া বাহির হইলাম—নূতন কোন গ্রামে কোন নূতন ব্যক্তির বাড়ীতে ঐ রাত্রিতে থাকিয়া যাজন চালান হইবে। এই উদ্দেশ্য হইতেই ঐ দিন জয়কুমারদা আমাকে নিয়া আমুদপুর গ্রামে বণিক্য পাড়ায় কোন বাড়ীতে গিয়া বসিলেন। স্বল্পক্ষণ আলোচনায় বুঝা গেল, উহাদের মধ্যে এই বিষয়ে চাহিদা আছে এমন কোন লোক নাই। অধিকন্তু উপস্থিত যে কয়জনকে দেখিলাম, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষাও অতিশয় কম। তখনই ঐ স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্য করিয়া আমরা রওনা হইলাম। তিন কি চারি মিনিটের পথ অতিক্রম করার পরেই পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া জয়কুমারদা বলিলেন—সম্মুখে ঐ যামিনীবন্ধু বাবুর বাড়ী, গ্রামের মধ্যে ইনি একজন বিশিষ্ট লোক, চলুন উহার সঙ্গে আলোচনা করা হউক। তাহার এই মন্তব্য প্রকাশের পরেই আমি তাহাকে বলিলাম, আগে আপনি গিয়া ভদ্রলোকের মনোগতভাব জানিয়া আসুন, পশ্চাতে আমার যাওয়া বরং ভাল মনে

করি। তদনুসারে জয়কুমারদা তখনই ঐ উদ্দেশ্যে চলিয়া গেলেন। আমি পথিপার্শ্বে বৃক্ষতলে সেই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই যামিনীবন্ধু বাবু নিজে জয়কুমারদার সাথে আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় নিয়া গেলেন। পরস্পর পরিচয় ও কথাবার্তা হওয়ার কিছু সময় পরে তিনি মন্তব্য করিলেন,—তাহার বিধবা এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী আছেন, তিনি বর্ষিয়সী তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া প্রশ্নো ও আলোচনা হইলে সবচেয়ে ভাল হইবে। তখনই তাহার ভগিনীকে সংবাদ দিয়া তথায় আনাইলেন। দেখিলাম, তিনি বাস্তবিকই বর্ষিয়সী, চক্ষু দুটী তীক্ষ্ণোজ্জ্বল, তিনি যে প্রখরা বুদ্ধিমতী তাহার চেহারাতেই প্রকাশ পায়। সেকালের মহিলা হইলেও আলাপে-সালাপে নিঃসঙ্কোচ অথচ উদার লক্ষ্য করিলাম। যামিনিদার নিকট হইতে শুনিতে পাইলাম তাহার এই ভগিনী বালবিধবা। সারাদিন পূজা-অর্চনা, স্তবস্তুতি, গীতাপাঠ ইত্যাদি সদনুষ্ঠান নিয়াই থাকেন, তৎপর অপরাহ্নে যৎসামান্য আহার গ্রহণ করেন। এই মহিলা আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বটে। সৎগুরু, বীজতত্ত্ব, মন্ত্রের চৈতন্য ইত্যাদি অনেক বিষয় তিনি উত্থাপন করিয়াছিলেন। আমিও যথাসম্ভব সেই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সন্ধ্যা আগত হইলে আমরা বিদায় চাহিলাম। যামিনীদা কিছুতেই ছাড়িলেন না, তাই রাত্রিতে থাকা হইল। আহারান্তে শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যামিনীদার সহিত আরো অনেক কথা হইল। "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" গ্রন্থ হইতে "দীক্ষা" অধ্যায়টী পাঠ করিয়া শোনান হইল। তাহার পরেই যামিনীদা সস্ত্রীক দীক্ষা নিবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকা দেখিয়া আগামী ১১ই আষাঢ় শুক্রবার দীক্ষার দিন স্থির হইল। দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে অবশ্যই কালাকাল নাই। ইহা সত্ত্বেও আমার ঐরূপ করার একমাত্র কারণ যামিনীদার নিজ সংস্কারে যাহাতে কোন প্রকার আঘাত না লাগে। পরদিন

প্রাতে আমি ও জয়কুমারদা ওখান হইতে ঘোষগাও ফিরিয়া আসিলাম। কয়েকদিন পরেই তথা হইতে আমি ঢাকা আসিলাম।

যামিনীদার সহিত আমার এই সাক্ষাৎকার হইয়াছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগে সুতরাং মাঝে অনেক সময় ছিল। আষাঢ়ের পহেলা কি দুই তারিখে যামিনীদাকে দীক্ষা সম্পর্কে পত্র দেওয়া হইল। ফেরত ডাকে উত্তর পাইলাম দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে তাহার সঙ্কল্প ঠিকই আছে। এই সংবাদ পাইয়া ঢাকা হইতে আমি আমুদপুর রওনা হইলাম। নির্দ্ধারিত তারিখে তিনি দীক্ষা নিলেন। কিন্তু তাহার জাতি খুড়ার পরামর্শে জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও স্ত্রীর মতের পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়ায় তাহাদের দীক্ষা আর সেই দিন হইল না। দীক্ষার পরে যামিনীদা আরও সপ্তাহকাল আমাকে তাহার বাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। আমিও তাহাকে আরো অধিক উদ্দীপিত করিবার মানসে তথায় রহিয়া গেলাম। এই সময়ের মধ্যে প্রতিবেশী লোকদিগকে আমার সহিত আলাপ-আলোচনা উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এত করা সত্ত্বেও নাম মাত্র দুই এক জন আসিয়া আমার সহিত দেখা করিল। তখন গ্রামবাসীদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলাম। তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম—প্রতিবেশীদের মধ্যে পরস্পর কোন সহানুভূতি নাই, কেহ কাহারো বাড়ীতে আসাযাওয়া করে না। প্রত্যেকেরই যেন ছন্ন ছাড়া জীবন, যে যার বৃত্তি মাফিক চলিয়াছে।

তথাকার এই অবস্থা আমার মনের উপর অতিশয় আঘাত করিল। রাত্রিতে শয়নকালে প্রত্যহ এই চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিত, আর ভাবিতাম ইহার কি প্রতিকার করা যাইতে পারে? অবশেষে এই উপায় স্থির করিলাম—যামিনীদাকে রাজী করাইয়া অনতিবিলম্বে তাহার বাড়ীতে একটি উৎসবের ব্যবস্থা যদি করিতে পারাযায় তাহা হইলে ইহার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইতে পারে। উৎসব উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া

গ্রামের সকলেই একত্রিত হইবে সুতরাং সেই সুযোগে উহাদের মধ্যে সৎসঙ্গের ভাবধারা চারাইয়া দেওয়া বরং সহজসাধ্য হইবে। রাত্রিতে ইহাই সাব্যস্ত করিয়া রাখিলাম। পরদিন প্রাতে যামিনীদার নিকট উহা প্রকাশ করিলাম। আমার এই প্রস্তাব তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। তখনই পঞ্জিকা দেখিয়া ফাল্গুন মাসে উৎসবের দিন-তারিখ ধার্য্য হইল। ইত্যবসরে তিনিও হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়া আসিতে পারিলেন। আমুদপুর সর্ব্ব প্রথম উৎসব হয় ১৩৪৯ সনে। এই উৎসব ৭ই ফাল্গুন শুক্রবার আরম্ভ হইয়া ৯ ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই দিবসত্রয় কীর্ত্তন, বক্তৃতা, আলোচনা ও প্রসাদ বিতরণ সমভাবে চলিয়াছিল। উৎসব যাহাতে সুষ্ঠভাবে সুনিষ্পন্ন হয় তজ্জন্য গ্রামবাসী সকলেই আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াছিল। বাহির হইতে বহু সৎসঙ্গীর সমাগমও হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষ্যে যে সমস্ত আলোচনা হইয়াছিল, তাহা হইতে স্থানীয় সকলেই সৎসঙ্গের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। আকৃষ্ট হইয়া ঐ উপলক্ষ্যে অনেকে "নাম"ও নিলেন। উহাদের মধ্যে রেবতীমোহন চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি যামিনীদার জ্ঞাতি ভাই। এক সময়ে ইনি সৎসঙ্গের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দীক্ষার পরক্ষণেই তিনি অকপট চিত্তে সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করেন। অনুতাপের সহিত তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছিলেন—আমাকে ঐ গ্রাম হইতে তাড়াইবার জন্য তাহার আগাগোড়াই চক্রান্ত ছিল। রেবতীদা তাহার এই ভুল বুঝিতে পারিয়া তখন দুঃখে খুবই ম্রিয়মান হইয়া পড়েন। তাহার যাজন ও কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া দীক্ষার কিছুদিন পরেই তাহাকে যাজকের পাঞ্জা দিয়াছিলাম। এক সময়ে ইহাদ্বারা সৎসঙ্গের একটী জরুরী কার্য্য উদ্ধার হইয়াছিল। নিম্নে সেই বিবরণ দেওয়া গেল। এই উৎসবের পরেই গ্রামবাসীদের মনের অনেক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। একে অন্যের বাড়ী যাতায়াত, দেখাশুনা করা, কথাবার্ত্তা

বলা ইত্যাদি চলিতে লাগিল।

আমুদপুর দ্বিতীয় উৎসব তথাকার শাখা-সৎসঙ্গের নিজস্ব ভূমিতে হইয়াছিল। তাই বিশেষ জাঁকজমকের সহিত ঐ অনুষ্ঠানের আরম্ভ ও সমাপ্তি। ঐ উৎসবের উদ্বোধন ১৩৫০ সনের ১৯শে ফাল্গুন, শুক্রবার—তিথি নবমী। ঐ তারিখে উৎসব আরম্ভ হইয়া ২১শে ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত তিন দিন ক্রমান্বয়ে চলিয়াছিল। ঐ উৎসবের প্রায় চারিমাস পূর্ব্বে যামিনীদার এক পত্র পাওয়া গেল—সাগরদির জমিদার পরিবারের নৃপেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী "নাম" নেওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত। তাই সত্বর আমুদপুর আমার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। এই পত্র পাওয়ার কয়েকদিন পরেই আমি ঢাকা হইতে আমুদপুর গেলাম। যথা সময়ে নৃপেনবাবু ও তাঁহার স্ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। উঁহাদের ঐকান্তিকতায় ও আগ্রহে আরো কয়েকদিন তথায় আমাকে থাকিতে হইল। তখন আমার আহারাদির ব্যবস্থা, কোনদিন যামিনীদার বাড়ীতে, কোন্‌দিন নৃপেনবাবুর বাড়ীতে, এই ভাবেই চলিতে লাগিল। উভয়ের মনস্তুষ্টি ও অনুরোধ রক্ষার্থে তখন এইরূপ করিতে হইয়াছিল। যামিনীদার বাড়ী হইতে নৃপেনবাবুর বাড়ী মাত্র দুই তিন মিনিটের পথ। সুতরাং সর্ব্বদা যাতায়াতের কোন অসুবিধা ছিল না। যতদিন তথায় ছিলাম উভয় বাড়ীতেই প্রত্যহ সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা হইত। বেশ আনন্দের মধ্যেই ওখানে থাকিলাম।

এই সময়েই রেবতীদা একদিন আমাকে জানাইলেন—গ্রামের এক খণ্ড জমির সত্বরই বিক্রয় কবলা হইতেছে। শাখা-সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করার উহা উপযুক্ত স্থান। যামিনীদা যদি জমি ক্রয় করেন তাহা হইলেই হইতে পারে। তখনই উঁহার সঙ্গে আমি জমি দেখিতে গেলাম। সরজমীনে গিয়া দেখিলাম—বাস্তবিকই উহা গ্রামের শীর্ষস্থান, সদর রাস্তার সংলগ্ন, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সম্পূর্ণ খোলা—কেবল খোলা মাঠ। বিশেষতঃ জমীর

অবস্থান অতীব সুন্দর, আমুদপুর ও নরেন্দ্রপুর উভয় গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে। জমি খুবই পছন্দ হইল। অনুসন্ধান লইয়া রেবতীদার নিকট হইতে জানিতে পারিলাম সাকুল্য জমি দুইভাগে বিভক্ত, উহার পূর্ব্বার্দ্ধ এবাতুল্লা সরকার কয়েকমাস পূর্ব্বে খরিদ করিয়াছে এবং অপরার্দ্ধের মালিকের সহিত ও এবাতুল্লার খরিদের কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, সত্বর কিছু না করিলে জমি হাতছাড়া হইয়া যাইবে। এই সঙ্গে রেবতীদা ইহাও জানাইয়া রাখিলেন—পূর্ব্ব বিক্রীত খণ্ড বর্ত্তমানে তাহারই দখলে আছে। জমি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই রেবতীদাকে সম্মুখে রাখিয়া এই সম্পর্কে যামিনীদার সহিত কথা উত্থাপন করিলাম। নিজস্ব ভূমিতে শাখা-সৎসঙ্গ স্থাপন করা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন নির্দ্দেশ দেন তৎকালে যামিনীদাও আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে তিনি এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, তাই তাহাকে এই সম্পর্কে আর অধিক বুঝাইতে হইল না। প্রস্তাবটি উত্থাপন করিতেই তিনি উহা সানন্দচিত্তে গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়াদিলেন—যে মূল্য প্রয়োজন তাহা দিতে তিনি প্রস্তুত কিন্তু উভয় জমি এক সঙ্গে খরিদ করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ এক অংশ নিয়া কিছুই হইবে না। আর যদি ঐভাবে জমি লওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে তিনি অগ্রসর হইবেন—নচেৎ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কার্য্য স্থির হইলে যে মূল্য লাগে তিনি তাহা চাওয়া মাত্র দিয়ে দিবেন, ইহাও স্পষ্ট বলিয়া রাখিলেন। উভয় খণ্ড জমী কি উপায় অবলম্বন করিলে একযোগে পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই হইল এখন চিন্তা করিয়া বাহির করার প্রধান বিষয়বস্তু। রেবতীদার সহিত পরামর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই সূত্রও পাওয়া গেল।

তাহার নিকট হইতে জ্ঞাত হইলাম, যে জমি বিক্রয় হইবে তাহার মালিক শরৎ মালী, আর পূর্ব্ব বিক্রীত খণ্ডের খরিদার এবাতুল্লা সরকার উভয়েই নৃপেন বাবুর প্রজা এবং তাহার নিকট দেনা-পাওনায় আবদ্ধ। সুতরাং

নৃপেন বাবুকে ধরিতে পারিলেই যে সহজে কার্য্য উদ্ধার হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলাম। তাই কালবিলম্ব না করিয়া তখনই রেবতীদাকে নিয়া নৃপেনবাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলাম এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা তাহাকে জানান হইল। এখন তিনি সৎসঙ্গী সুতরাং ইষ্টস্বার্থ দেখা তাহারও কর্ত্তব্যের মধ্যে—এইভাব নিয়াই নৃপেনবাবু এই কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখনই তিনি দারোয়ান পাঠাইয়া মালীকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিয়া তিনি জমি রাখিবেন, ইহাও জানাইয়া রাখিলেন। অপরদিকে এবাতুল্লা সরকারকেও সংবাদ দিয়া আনিলেন। তাহার জমি কেন প্রয়োজন, ইহাও তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন। এই সম্পর্কে সন্ধ্যার পরে উত্তর দিবে বলিয়া এবাতুল্লা সরকার চলিয়া গেল। পরদিন গিয়া জানা গেল, এবাতুল্লা আসে নাই। সুতরাং পুনরায় দারোয়ান পাঠাইয়া তাহাকে আনান হইল, কিন্তু তাহার মত কি স্পষ্ট করিয়া বলিল না; কেবল আমতা আমতা করিয়া চলিয়া গেল। এইরূপ ডাকা-ডাকিতে কয়েকদিন চলিয়া গেল, বাস্তবে কিছুই হইল না। অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া একদিন গ্রামের মাতব্বরদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নৃপেনবাবুর বাড়ীতে আনাইয়া এই বিষয়ে তাহাদিগের সহায়তা চাওয়া হইল। তাহারা আমাদের বক্তব্য শুনিয়া সকলেই এই শুভ উদ্দেশ্যে সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল। নৃপেনবাবু ও গ্রামের মাতব্বরদিগের একান্ত প্রচেষ্টায় ঐ জমি পাওয়ার ব্যবস্থা হইল। ইহার পরেই উভয় খণ্ড জমির একইদিনে কবলা রেজিষ্টারী করা হইল। উভয় জমির জন্য মোট মূল্য ছয়শত টাকা যামিনীদাকে দিতে হইয়াছিল। প্রথম কবলা যামিনীদার নামে হইয়াছিল। তৎপর দানপত্র লিখিয়া যামিনীদা উহা আবার ইষ্টোত্তর করেন।

উল্লিখিত ইষ্টোত্তর দলিল রেজিষ্টারী করার দিন প্রাতে ঐ ভূমিতে বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো স্থাপন করা হইল। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে

গ্রামবাসী সকলকে আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া বিনতি-প্রার্থনান্তে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর সম্মুখে যামিনীদা দানপত্র আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তদনন্তর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণামী পঞ্চাশ টাকা সহ ঐ দানপত্র আমার হাতে অর্পণ করিলেন। আমিও সকলকে নিয়া "বন্দে পুরুষোত্তমম্" ধ্বনি করিয়া উহা শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর সম্মুখে রাখিলাম। এই শুভ কার্য্যে পৌরহিত্য করার দক্ষিণাস্বরূপ দশ টাকা আমাকে যামিনীদা দিয়াছিলেন। অনুষ্ঠান সমাপনান্তে সকলকে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হইল। ঐ দিনই ঐ দানপত্র রেজিষ্টারী হইয়াছিল। অফিস হইতে ঐ দলিল ফেরত পাওয়ার পরেই উহা আশ্রমে পাঠানো হইয়াছিল। এই কার্য্য নিষ্পন্নের জন্য আমাকে মাসাধিককাল আমুদপুর থাকিতে হইয়াছিল। জমি খরিদের পর গৃহাদি উত্তোলন ও অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে আরো দুই মাস লাগিয়াছিল। তাই শাখা-সৎসঙ্গ উদ্বোধনের তারিখ পিছাইয়া ফাল্গুন মাসে হইয়াছিল। যামিনীদার বৃদ্ধা মা পূর্ব্ব হইতেই দীর্ঘ দিন রোগে জরাজীর্ণ ছিলেন। এই উৎসব আরম্ভ হইবার দুই তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আরও কাতর হইয়া পড়েন। বহু পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল ৺গয়াধামে গিয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আসিবেন। সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও বার্দ্ধক্যহেতুও দেহের অপটুতা নিবন্ধন তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই। শাখা-সৎসঙ্গ গৃহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বক্ষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের বৃহদায়তনের ফটো-খানা ঐ বৃদ্ধা মায়ের নিকট নেওয়া হইল। শায়িত অবস্থায়ই হাত উত্তোলনপূর্ব্বক তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করিলেন আর অনিমেষনেত্রে দয়ালের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্রুপূর্ণনয়নে আবেগের সহিত তিনি করুণকণ্ঠে বলিলেন—"বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আজ আমার পূর্ণ হইল।" তন্মুহূর্ত্তে আমিও মাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলাম—"জীবন্ত গুরুপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর! তাঁহার প্রতিষ্ঠা আপনার বাড়ীতে। আপনার জীবন আজ ধন্য"। তৎপরে ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

শাখা-সৎসঙ্গের উদ্বোধন গৃহে নিয়া স্থাপন করা হইল। যথারীতি পূজা, অর্চ্চনা, হোম ও অভ্যাগতদিগের ভোজন সংক্রান্ত ব্যাপার সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরেই বৃদ্ধমাতাজীর অবস্থা অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, স্বল্পক্ষণ পরেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। যামিনীদা এই অবস্থায় কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া আমার উপর যাবতীয় কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া মা'র সৎকার কার্য্যে শ্মশান ভূমিতে চলিয়া গেলেন এবং অনুষ্ঠানের কোন প্রকার অঙ্গহানি না হয় তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া গেলেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য মাত্র কয়েকজন শ্মশান ভূমিতে গিয়াছিল। অপরাপর সকলেই উৎসব ক্ষেত্রে গিয়া যার যার কার্য্যে ব্রতী হইলেন। বক্তৃতা, আলোচনা ও নাট্যাভিনয় ইত্যাদি যাহা অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত বলিয়া সূচীপত্রে ছিল, তৎসমুদয়ের কোন প্রকার ব্যতিক্রম হইয়াছিল না। এই সভাতে সভাপতি ছিলেন রায়সাহেব রাজেন্দ্র কুমার রায়, প্রধান বক্তা ছিলেন নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ বি-টি, কেদারনাথ দাস বি এ, ডাঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দাস। এতদ্ব্যতীত ইস্লাম মত সম্বন্ধে দুইজন মৌলভীও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মাতৃ-সম্মিলনীর বক্তৃ ছিলেন যামিনীদার জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুমুদিনী দেবী, ক্ষীরোদবাসিনী সাহা, আর উদ্বোধন সঙ্গীত করিয়াছিলেন রবি বাবুর স্ত্রী। জমি ক্রয়োপলক্ষে দীর্ঘদিন তথায় আমাকে থাকিতে হইয়াছিল। ঐ অবসরে ঐ অনুষ্ঠানে অভিনয় করার উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা সমন্বিত ছোটখাট একখানা নাটক লিখার আমার সুযোগ হইয়াছিল। ঐ উৎসব উপলক্ষ্যে উক্ত নাটকের অভিনয়ও হইয়াছিল। সাগরদীর জমিদার পরিবারের নগেনবাবু ও রমেশবাবু এই দুইজন ছিলেন উক্ত অভিনয়ের মাষ্টার ও প্রধান পরিচালক। নৃপেনবাবু যিনি জমি ক্রয় বিষয়ে যাবতীয় অন্তরায় উদ্ধার করিয়া কার্য্য সুনিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, তিনি তৎকালে দূরদেশে থাকায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এই শাখা-সৎসঙ্গ উদ্বোধনের পর হইতেই গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর

মিলামিশা শুরু হইল। একে অন্যের বাড়ী যাতায়াত করিতে লাগিল, ইহাতে তাহাদের ছন্নছাড়া জীবনের মধ্যে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ঐক্যবন্ধনের সূচনা দেখা দিল। তদবধি গ্রামের সকলেই সাপ্তাহিক অধিবেশনে নিয়মিতভাবে যোগদান করিত। আর ঐ সময় হইতেই "ইষ্টভৃতির ভ্রাতৃভোজ্য" ও অন্য প্রকারে যাহা হইত, তাহা সংগৃহীত হইয়া যামিনীদার কাছে জমা হইত। তদ্দ্বারা তিনি স্থানীয় দুঃস্থদিগের ঔষধপত্র ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। এখানেই আমুদপুরের বিবৃতি সমাপ্ত। এখন মনোহরদীর বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

মনোহরদী—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রথম যাত্রা ঘোষগাও গিয়া তিন সপ্তাহের উপরে ছিলাম। সেই সময়েই মনোহরদী সবরেজিষ্ট্ররের বাসায় যাওয়া হয়। জয়কুমার দাসের নিকট শুনিয়াই সবরেজিষ্ট্ররবাবু আমাকে তাহার বাসায় যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন। জয়কুমারদা ঐ আফিসের মোক্তার, তাই কার্য্যকারণসূত্রে উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বাবধি জানাশোনা ছিল। ঘোষগাওর সতীশ আমাকে মনোহরদী নিয়া গিয়াছিল। তথায় আমি উপস্থিত হওয়ার পরক্ষণেই জয়কুমারদা আমার পরিচয় দিলেন। আমার নাম শুনিয়াই তখন সবরেজিষ্ট্ররবাবু বলিয়া ফেলিলেন—তিনি আমার নাম তাহার জ্যেষ্ঠতাত ভ্রাতা মণীন্দ্রমোহন দাসের নিকট আগেই শুনিয়াছেন, আর তাহারা যে আমার নিকট দীক্ষিত, ইহাও তিনি জ্ঞাত আছেন। তাহাদের নিকট শোনা থেকেই আমাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। অদ্য যে সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, ইহাও তখন তিনি প্রকাশ করিলেন। এই পর্য্যন্ত হওয়ার পরেই জলযোগের ব্যবস্থা হইল। তৎপরে আবার শ্রীশ্রীঠাকুর, সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও তথাকার কর্ম্ম-পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্পর্কে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। সর্ব্বশেষে সৎনামের মাহাত্ম্য, সদ্গুরু হইতে

দীক্ষা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং জীবন্ত সদ্‌গুরুর একান্ত আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে আলোচনা হওয়ার পরেই ইহা সাব্যস্ত হইল, আগামী দিন সবরেজিষ্ট্ররবাবু ও তাহার স্ত্রী দীক্ষা নিবেন। এই পর্য্যন্ত হওয়ার পরেই জয়কুমারদা ঘোষগাও রওনা হইলেন। আমি আর সতীশ ওখানে রহিলাম। প্রাতে ঐ দীক্ষাকার্য্য শেষ হইয়া গেল। বিকালে ঘোষগাও রওনা হওয়ার কথা উত্থাপন করিতেই সবরেজিষ্ট্ররবাবু অন্ততঃ আরো তিনদিন থাকার জন্য আগ্রহ করিলেন। দীক্ষার পরে কিছুদিন আচার্য্যের সঙ্গ করা শাস্ত্রবিধি—এই মনোগতভাব হইতেই তিনি ঐ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাই তাহার বাসায় তিন দিন ছিলাম। যাহার সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা হইতেছে, ইনিই সুপরিচিত সঙ্গভ্রাতা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়দাস, বর্ত্তমানে আলিপুর রেজিষ্ট্রর। এখন এই প্রসঙ্গের সহিত যাহা প্রয়োজন বলিতেছি—মনোহরদী মহেশরদী পরগণা মধ্যে একটি প্রয়োজনীয় স্থান। এখানে থানা, রেজিষ্টারী অফিস, জমিদারী কাছারী, ইউনিয়নবোর্ড, স্কুল, বাজার অনেক কিছু আছে। ওখানে একটি ক্লাবও আছে। স্থানীয় অফিসর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সকলেই সন্ধ্যার পরে ঐ ক্লাবে গিয়া একত্রিত হয়। খবরের কাগজ পড়া, গল্পগুজব করা, তাসখেলা এই সমস্ত হইল তথায় সম্মিলনের উপভোগ্য বস্তু। এই দিন ক্ষিতীশদা অফিসের কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া একটু আগেই বাসায় আসিলেন। তৎপরে আমার সাথে তিনি কিছুক্ষণ থাকিয়া আলাপ আলোচনা করার পরেই ক্লাবে রওনা হইলেন। ক্লাব হইতে বিলম্বে ফিরিলে আমার থাকা যে নিরর্থক হইবে, আর সঙ্গহীন অবস্থায় থাকাও অধিকতর কষ্টকর হইবে, তাই একটু সকালে ফিরিবার কথা বলিয়া দিলাম। আমার এই সমস্ত উক্তি যে তাহার মনের উপর ক্রিয়া করিয়াছিল তাহা আমি পরে বুঝিতে পারিলাম। ক্লাব হইতে ক্ষিতীশদা অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই বাসায় ফিরিলেন। আসিয়াই তিনি প্রকাশ করিলেন চিন্তা করিয়া দেখিলাম ক্লাবে খেলায় সময় নষ্ট

করার চেয়ে আপনার সঙ্গকরা বরং ভাল, তাই সকালেই চলিয়া আসিয়াছি। ইহার পরেই তাহাকে ও তাহার বাসার অন্যান্যকে নিয়া সন্ধ্যার বিনতি ও প্রার্থনা করিলাম। তৎপরে সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠকরা হইল। এই অনুষ্ঠানের সর্ব্বশেষে ক্ষিতীশদা এই সঙ্কল্প জানাইলেন, ক্লাবে গিয়া আর তাস খেলিবেন না, স্থির করিয়াছেন প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে বাসায় ছেলেমেয়ে-স্ত্রী সকলকে নিয়া বিনতি-প্রার্থনা, শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ বাণী পাঠ এবং আলোচনা ইত্যাদি করিবেন। বাস্তবিক এই সঙ্কল্প তিনি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। যে তিন দিন আমি তথায় ছিলাম, দেখিয়াছি, প্রত্যহ ক্লাব হইতে লোক বাসায় আসিয়া খেলার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিত, আর তাহা তিনি অম্লানচিত্তে প্রত্যাখান করিতেন।

ক্ষিতীশদার উদ্দেশ্যে কয়েকমাস পরেই আবার আমি মনোহরদী গেলাম। তখন দেখিলাম—ক্ষিতীশদা নিজেই আগ্রহপূর্ব্বক যাজন করিয়া থাকেন। তাই অফিসের পরে তাহাকে নিয়া যাজনে বাহির হইবার বুদ্ধি করিলাম। তিনিও সানন্দচিত্তে তাহা করিতে রাজী হইলেন। অফিস হইতে বাসায় আসিয়াই, জলযোগ করিয়া তিনি আমার সাথে বাহির হইতেন, আর অধিক রাত্রিতে ফিরিতে হইত। সারাদিন অফিসে পরিশ্রম করা সত্বেও তাহার উপর এই হাটাহাটি করিতে কোনদিনই তাহার ম্লানমুখ দেখি নাই বরং তাহাকে প্রফুল্ল দেখা গিয়াছে। এই সময়েই ক্ষিতীশদা স্বস্ত্যয়নী গ্রহণ করেন, আর ইষ্টভৃতি বাড়াইবার জন্য সিগারেট খাওয়া বন্ধ করেন। আশ্রমের কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার সময়ে জমি খরিদের জন্য তিনি এককালীন তিনশত টাকা অর্ঘ্যও দিয়াছিলেন। ইহার আন্তরিক যাজন ও অকুন্ঠিত কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়াই আমি নিজে উদ্যোগী হইয়া তাহাকে সহ-প্রতিঋত্বিকের পাঞ্জা দেওয়াই। পাঞ্জা স্বাক্ষর করিয়া দেওয়ার সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ইহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে ক্ষিতীশচন্দ্র দাস বলিতেই, শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসাহব্যঞ্জক বাক্যে বলিলেন—শুধু

দাস হবে না, রায়দাস হবে। ইহার পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর নামের স্থলে স্বহস্তে ক্ষিতীশচন্দ্র রায়দাস লিখিয়া পাঞ্জা স্বাক্ষর করিয়া দেন। তদবধি আমি চিঠিপত্রে তাহাকে "রায়দাস" লিখিয়া আসিতেছি। যেহেতু এই উপাধি স্বয়ং পুরুষোত্তমের প্রদত্ত। তাই ইহার সম্মানসূচক ব্যবহারও আমাদের করণীয়।

যতদিন ক্ষিতীশদা মনোহরদী ছিলেন ঐ অঞ্চলে সৎসঙ্গের যাজন বেশ জোরেই চলিয়াছিল। তাহার শিষ্ট ব্যবহার ও উদারতায় মুগ্ধ হইয়া তখন অনেকেই এই সৎমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে শেখর গ্রামের যাদবচন্দ্র দত্ত কবিরাজ আর রসিকচন্দ্র দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দীক্ষার দুই বৎসর পরেই মনোহরদী হইতে ক্ষিতীশদার শ্রীনগর বদলি। এই সময়েও আমি যাজন উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে ঢাকা হইতে শ্রীনগর যাইতাম। বিশেষতঃ রবিবারের ছুটির দিন তাহাকে নিয়া যাজনে বাহির হইতাম। এইভাবে তাহার আমলে হরপাড়া দেলভোগ, পাটাভোগ, শ্যামসিদ্ধি, ষোলঘর, কেওটখালি হাসারা, শেখরনগর, রাজানগর, হাষিয়ামুন্সিয়া, প্রাণীমণ্ডল, কুশারীপাড়া, রাড়িখাল, সিংপাড়া, বেলতলী, কোলা, মালখানগর প্রভৃতি গ্রামে সৎসঙ্গের ভাবধারা বিপুল বিস্তার লাভকরে।

এই সময়েই ক্ষিতীশদার বাসা হইতে একদিন শ্রীনগর দিঘীরপাড় ভগীরথ সাহার বাড়ীতে প্রয়োজন বশতঃ আমাকে নেওয়াইয়াছিল। ঐ পরিবারের কিরণবালা সৎসঙ্গী। কিরণই তাহার খুড়াত ভগ্নিকে 'নাম' দেওয়ার জন্য সংবাদ পাঠাইয়া আমাকে নিয়াছিল। কিরণ নিজে বাল-বিধবা। তাহার ঐ ভগ্নিও বাল-বিধবা। তাই উভয়ের মধ্যে সহানুভূতিসূচক নিবিড় হৃদ্যতা ছিল। কিরণ আর কিরণের মায়ের একান্ত আগ্রহেই সরলাকে "নাম" দেওয়া হইল। সরলা দীক্ষিত হওয়ার সাথে সাথেই উহাদের অপর হিস্যার এক ব্যক্তি ঈর্ষাবশতঃ সরলার দেবরকে এই সংবাদ জানাইয়া আসে। আহারান্তে বিশ্রামকালে উপস্থিত কয়েকজনকে নিয়া আমার আলাপ-আলোচনা

হইতেছিল। এমন সময়ে বাহিরে খুব হই-হল্লা শুনিতে পাওয়া গেল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য কিরণ তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সরলা যে দীক্ষা নিয়াছে এই খবর পাইয়া তাহার দেবর উত্তেজিত হইয়া লোকজন নিয়া আসিয়াছে; আর তাহার মাকে এই জন্য জবাবদিহি করিতেছিল। উহারা যে সমস্ত অশ্রাব্যকটু উক্তি করিতেছে তাহা আমিও ঘরের ভিতর হইতে শুনিতে পাইতেছিলাম। উহার মধ্যদিয়া আমার প্রতিও কটাক্ষপাত করা হইতেছিল। যখন উহাদের ঐ আচরণ মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিল তখন আবার কিরণ ঘর হইতে বাহিরে গেল। ঐ সময়ে কিরণ-মা নির্ভয়ে তেজস্বিতার সহিত যুক্তিপূর্ণ যে সমস্ত উত্তর দিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসারযোগ্য। অসৎ-নিরোধী এই প্রকার তেজস্বীতা প্রত্যেক নারীর থাকাই বাঞ্ছনীয়। শ্রীনগরের এই প্রসঙ্গের সাথে এক পণ্ডিত ব্যক্তির কথা মনে পড়িল।

সে যাত্রা ক্ষিতীশদার বাসা হইতে গহেনার নৌকায় ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলাম। তখন এক পণ্ডিতের সাথে দেখা হয়। যাত্রীদিগের মধ্যে নানাপ্রকার মামুলি কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। যাজন উদ্দেশ্যে আমিও ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদের সহিত যোগদান করিলাম। "সদ্‌গুরু" এই শব্দ শুনিয়াই একব্যক্তি অকস্মাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন গুরু আবার সৎ—অসৎ কি? ইহার পরক্ষণেই তিনি নিজ হইতে এই উক্তি করিলেন, গুরু—চিরদিনই সৎ। তদুত্তরে আমি বলিলাম এই বাক্য সত্য বটে; কিন্তু গুরুতা যৎকালে পেশায় আসিয়া দাঁড়াইল, অগুরু গুরুস্থান অধিকার করিয়া অন্যায় আধিপত্য চালাইতে থাকিল, মনে হয় তখন হইতেই গুরুর বৈশিষ্ট্য রক্ষার উদ্দেশ্যে "সদ্‌গুরু" এই শব্দের ব্যবহার আরম্ভ। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, গুরু বংশের অনধিকারী ব্যক্তিও শিষ্য করিয়া থাকেন, ইহা সমীচীন নয়। তদুত্তরে তিনি বলিলেন—গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু। আবার ব্যাখ্যা করিতে থাকিলেন—গুরুপুত্র সে যেমনই হউক, শিষ্যের বিচারের কোন অধিকার নাই। জানেন—গুরুত্যাগ

মহাপাপ। আমি তখন উত্তর করিলাম শিষ্য হইলে পরে বিচার চলে না, কিন্তু মন্ত্র গ্রহণের পূর্ব্বে এই বিচার নিছক প্রয়োজন। তাই আপনার সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। অবশেষে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি একজন পণ্ডিত, উপাধি বিদ্যাভূষণ, অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ, বর্ত্তমানে ঢাকা-কলেজিয়েট স্কুলের সংস্কৃতের প্রধান শিক্ষক। আত্ম-পরিচয় দিতে গিয়া শেষ মুহূর্ত্তে ইহাও তিনি প্রকাশ করিলেন —কোন রাজকুমারের তিনি শিক্ষা বিষয়ে অভিভাবক। অতঃপর আরো জানা গেল তখনও তাহার দীক্ষা হয় নাই। বয়স পঞ্চাশ বৎসরেরও উর্দ্ধে। ইহাতে আমি বিস্মিত হইলাম! তখন খোলাখোলি ভাবে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম—তাহার পিতার গুরু যিনি, তিনি বহুকাল পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, গুরুপুত্র—সেও এখন নাবালক—বয়স দশ বৎসর মাত্র। গুরু-মা জীবিত আছেন কিন্তু স্ত্রীলোক হইতে দীক্ষা নেওয়া বিধি নয়, তাই গুরুপুত্রের অপেক্ষায় আছেন। আরও জানিতে পারিলাম—আগামী বৎসর গুরুপুত্রের উপনয়নের দিন ধার্য্য হইয়াছে। ইহার পরে সেও তাহার গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র নিবে। অতঃপর পণ্ডিত মহাশয় ঐ গুরুপুত্র হইতে মন্ত্র নিবেন—এই সঙ্কল্প। পণ্ডিত মহাশয়ের এই প্রকারের অদ্ভুত উক্তি শুনিয়া আমার হাসি পাইল। যাত্রীদের মধ্যেও কেহ কেহ যে এই হাস্যরসের অংশ গ্রহণ না করিয়াছিলেন—এমন নয়। তখন আমার তরফ হইতে পণ্ডিতমহাশয়কে বলা হইল—আপনি যে এম-এ ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই কলেজের অধ্যাপকের নিকট বিহিতকাল বিহিতভাবে পঠন-পাঠন করিয়া অর্জ্জিত। একথা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারেন না? আর আপনার অধ্যাপকও যিনি, তাহাকেও ঐ নীতি অনুসরণ করিতে হইয়াছিল, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন নাবালক গুরুপুত্র দীক্ষা গ্রহণের পরই আপনাকে যে দীক্ষা দিবে সেই জ্ঞান লাভের সম্ভাব্যতা তাহার কখন? আপনার

এইপ্রকার কল্পনার তাৎপর্য্য কিছুতেই আমার বুদ্ধিতে লাগাইল পাইতেছে না। এত রকমে বুঝান সত্ত্বেও যখন পণ্ডিতজী বোধের ধার দিয়াও আসিলেন না, তখন আমি নিরুপায় হইয়া নিজেই চুপ করিয়া রহিলাম।

এই ঘটনার দুইবৎসর পরে ঢাকা—কমলাপুর এই পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ ঘটে। কৌতুহল নিবারণার্থে তখন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম সেই নাবালক গুরুপুত্র হইতেই পণ্ডিতজী দীক্ষা নিয়াছেন। এইপ্রকার পাণ্ডিত্যের পণ্ডাধীন যাহারা চলিয়া থাকেন তাহাদের পরিণতি কোথায় তাহা সুধীগণের বিচার সাপেক্ষ।

সৎসঙ্গের ভাবধারা বিস্তার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইতেছিল—ঘোষগাও কেন্দ্র করিয়া কার্য্যারম্ভের ন্যূনাধিক ছয়মাস মধ্যে মহেশ্বরদি পরগণায় ব্যাপকভাবে যাজন চলিতে থাকে। ঐ সমস্ত অঞ্চলে যানবাহনে যাতায়াতের কোনই সুবিধা ছিল না, তাই বহুগ্রামে পর্য্যটন করিয়াই কার্য্য করিতে হইয়াছিল।

যাজক সতীশচন্দ্র দাস আমার সাথী ছিল। ঘোষগাও হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে টঙ্গিরটেক, তৎপরে চন্দনপুর, ক্রমে বেলাবো, রাঙ্গুনীয়া, শিবপুর, শ্রীনিধি, রায়পুরা, হাসিমপুর, আমিরাবাদ, নরসিংহদি, ঘোড়াশাল, কালিগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইয়া অতঃপর গোলাকান্দাইল, মুড়াপাড়া ও মাঝিনা বাবুরহাট হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা গিয়াছিলাম। বেলাবো হইতে নদীর পূর্ব্ব পার যাওয়ার পরেই ঐ সমস্ত স্থানের অবস্থা অন্যরূপ দেখিলাম। কিছুদূর গেলেই স্থানীয় মুসলমানগণ খোঁজ নিতে আরম্ভ করিল—কোথা হইতে আসা হইয়াছে, কেন, কোথায় যাওয়া হইবে ইত্যাদি প্রশ্ন। এইরূপ অনুসন্ধান রাঙ্গুনিয়া হইতে আমিরাবাদ পর্য্যন্ত বেশ তীব্রভাবে চলিয়াছিল। গতিবিধি সম্পর্কে স্থানে স্থানে এই প্রকার প্রশ্ন হইতে ও প্রশ্নকারীদের মুখের ভাব দৃষ্টে মনে হইল এই সমস্ত স্থান যেন আসন্ন বিপদের সম্মুখে। শ্রীনিধি গ্রামে রজনীকান্ত রায়ের বাড়ীতে বিশ্রামার্থে একরাত্রি ছিলাম।

পথে পথে যাহা হইয়াছিল এবং অনতিদূরে যে বিপদ অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি সম্পর্কে তখন তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলা হইয়াছিল। অধিকন্তু গ্রামের পারশবদিগের সহিত মিলামিশা করিয়া সংহত হইতে পারিলে যে ভবিষ্যতের মঙ্গল হইবে, ইহাও কথাবার্ত্তার মধ্যদিয়া তাহাদিগকে জানান হইল। এই সমস্ত কথাবার্ত্তা যখন হইতেছিল, তৎকালে রজনী বাবুর জাতিভাই মাষ্টার শ্রীনাগবাবু উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের এই সমস্ত কথায় বেশী গুরুত্ব দিলেন না। বলিতে কি, আমরা ঐ অঞ্চল হইতে চলিয়া আসার দুই মাস পরেই ঐ সমস্ত স্থানে সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে ভীষণ রায়ট আরম্ভ হয়। ঐ রায়টে লুণ্ঠনরাজ ও অগ্নিকাণ্ডে মোট ছিয়ষট্টি গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আর গ্রামবাসী সমস্ত হিন্দুরা বাড়ীঘর ছাড়িয়া স্থানান্তর চলিয়া গিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার আট কি দশ দিন পরেই আমি আর ডাঃ ব্রজেন্দ্রকুমার দাস উভয়ে শ্রীনিধি চলিয়া যাই। যাওয়ার হেতু—ঐ গ্রামে কয়েক ঘর পারশব সৎসঙ্গী ছিল। তাহাদের খবর নেওয়াই ছিল—মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রামে গিয়া দেখিতে পাইলাম পারশবগণ সকলেই নিজ নিজ বাসস্থানে আছে। আরো জানিতে পারিলাম তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আক্রমণ প্রতিরোধ করায় তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। আর রায়দের বাড়ী গিয়া দেখিলাম সমস্ত গৃহ ভস্মীভূত। পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিলে যে আত্মরক্ষা সুনিশ্চিত, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল ওখানে পারশবদিগের মধ্যে।

পূর্ব্ববর্ণিত মহেশ্বরদি পরগণায় যাজন উপলক্ষে পর্য্যটনের মধ্যে আমাদের প্রথম লক্ষ্য স্থান ছিল রায়পুরা, আর দ্বিতীয় লক্ষ্যস্থান আমিরাবাদ। যেহেতু পাঠ্যজীবনে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লিখিত উভয় স্থানেই ছিলেন। রায়পুরা স্কুলে তিনি কিছুকাল পড়িয়াছিলেন। রায়পুরা গ্রামের চক্রবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিয়া তখন তিনি পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে তৎকালের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা ঐ চক্রবর্ত্তী পরিবারের

লোকের নিকট হইতে জানা হইল। আর তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে আমদের যাহা জানান প্রয়োজন তাহাদিগকে তাহাও জানান হইল। রায়পুরা হইতে পথে অন্তঃর্বর্ত্তী গ্রাম সমূহে কাজ করিয়া পরে আমিরাবাদ গিয়াছিলাম। এইখানেই গোলকপুর রাজকাছারীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। সেই সময়েই জননী মনোমোহিনীদেবী ও ঠাকুর তথায় ছিলেন। আমিরাবাদ স্কুল ছিল না, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর রায়পুরা স্কুলে পড়িতেন। আমিরাবাদ গিয়া প্রথমেই উক্ত কাছারীতে গেলাম এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা প্রভৃতি যেই গৃহে থাকিতেন সেই সমস্ত ঘর দর্শন করিলাম। কাছারীর পার্শ্বেই পালদের বাড়ীতে গিয়া আমরা উঠিয়াছিলাম। সেই বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাঠসাথী ও খেলার সাথী কয়েকজন পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের নিকট হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তৎকালের কোন কোন ঘটনা শুনিয়া নিলাম। আমরাও আমাদের জ্ঞাত যাহা কিছু তাহাদিগকে জানাইলাম। দুইদিন ওখানে ছিলাম। বেশ আনন্দেই দিনগুলি গিয়াছিল। আমাদের নিকট হইতে শোনার পরে তথা হইতে হিমাইতপুর আশ্রমে কেহ কেহ আসিয়াছিলেন।

এখানেই ঢাকা জেলায় সংকৃত যাজনের বিবৃতির পরিসমাপ্তি। এখন ময়মনসিংহ জেলার কার্য্যবিস্তারের ইতিবৃত্ত বলা যাইতেছে।

ময়মনসিংহ জেলা—

ময়মনসিংহ টাউন, কিশোরগঞ্জ সদর ও তদন্তর্গত বুরুদিয়া, মঠখলা, নীলগঞ্জ, গচিহাটা, আঠারবাড়ী, সরারচর, বাজিতপুর সদর, ঈশ্বরগঞ্জ সদর, গৌরীপুর, রামগোপালপুর, নেত্রকোণা সদর, বাড়হাট্টা, মোহনগঞ্জ, পূর্ব্বধলা, কালিবাজার, রামামৃতগঞ্জ, ধলা, সেনবাড়ী, গফরগাও, মুক্তাগাছা, নান্দিনা, বেগুনবাড়ী, পিয়ারপুর, জামালপুর সদর, সাহাবাজপুর, কেন্দুয়াকালীবাড়ী, বাউসীবাঙ্গালী, মেন্তা, সরিষাবাড়ী, ধর্ম্মকুড়া, প্রজেন্টনগর, ইসলামপুর,

হেমনগর, সেরপুর টাউন, দিঘপাইত সৎসঙ্গের ভাবধারা প্রচার উদ্দেশ্যে যাওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে ময়মনসিংহ টাউন, মুক্তাগাছা, জামালপুর সদর ও সেরপুর টাউন এই কয় স্থানের কাষ্য-বিবরণী এই স্থানে বিশেষভাবে দেওয়া হইল।

ময়মনসিংহ টাউন—

উক্ত জেলায় যাজন উদ্দেশ্যে প্রথম ময়মনসিংহ টাউনে যাই। মনে আছে ১৩২৮ সনের প্রথমভাগে। ময়মনসিংহ বারের বিশিষ্ট উকিল রাইমোহন মুখোপাধ্যায় আমার পূর্ব্ব পরিচিত। অধিকন্তু তাহার সাথে বন্ধুতাও ছিল। তাই তাহার বাসায় উঠিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্পর্কে আমার নিজস্ব যাবতীয় ঘটনা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম এবং সাথে সাথে "নাম" নেওয়ার জন্যও আবদার করিতে থাকিলাম। রাইমোহনদা আমার কথার উপরেই নির্ভর করিয়া "নাম" নিতে রাজী হইলেন। দুইদিন পরেই তিনি "নাম" নিলেন। তাহাতে আমার উৎসাহ বাড়িয়া গেল। এখন তাহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বাসায় সৎসঙ্গের এক অধিবেশন করা হইল। তদুপলক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিদিকে নিয়া জোরে যাজন করা গেল। রাইমোহনদাও পৃষ্ঠপোষক হইয়া আমাকে সমর্থন করিয়া অনেক কথা বলিলেন। তাহাতে এই ফল হইল—ময়মনসিংহ বারের প্রবীণ উকিল বাণেশ্বর পত্রনবীশ "নাম" নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, আর পরদিন সকালে তাহার বাসায় যাওয়ার অনুরোধ করিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে আমি তাহার বাসায় গিয়াছিলাম এবং তিনি দীক্ষাও নিয়াছিলেন। ইহাদের সহায়তায় ময়মনসিংহ উকীল-বার, দুর্গাবাড়ী, আনন্দমোহন কলেজ, সিটিস্কুল, মৃত্যুঞ্জয়-হাই, গার্লস-হাই প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা ও আলোচনা করার সুযোগ হইল। ক্রমে ক্রমে লোকজন আসিয়া দেখা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের সাঙ্গে আলোচনার ফলে কেহ কেহ দীক্ষাও নিয়াছিল। তৎসময়েই উকীল রাইমোহনদার বাসায় সাপ্তাহিক

অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়। তখন হইতেই ময়মনসিংহ টাউনে আসাযাওয়ার এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক হইয়া রহিল। এই ভাবে কার্য্যকারণ উপলক্ষে ১৩৩০ সনের শ্রাবণ মাসের শেষভাগে ময়মনসিংহ টাউনে একবার যাইতে হইয়াছিল। সেই সময়েই ব্রজগোপাল দত্তরায় উকীল ও তাহার স্ত্রী দীক্ষা নেয়। শ্রাবণ মাসের আটাইশ তারিখে তাহারা দীক্ষা নিয়াছিল। দীক্ষা গ্রহণের ছয় মাস পরেই ওকালতী ব্যবসায় ছাড়িয়া ব্রজগোপালদা সস্ত্রীক হিমাইতপুর চলিয়া যান। তদবধি শ্রীশ্রীঠাকুরের লোকহিতকর কর্ম্মানুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়া একাধিক্রমে তিনি দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করেন। আশ্রমে অবস্থান কালেই "শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ ব্রজগোপালদা প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক ১৩৪৩ সনের আষাঢ় মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ব্রজগোপালদা কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন বনগ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু দত্তরায় পরিবারের সন্তান। তিনি যখন আশ্রমে আসেন তখন তাহার পুত্র রজতবরণ মায়ের কোলের শিশু। শ্রীমান্ রজত শৈশব হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বাস করিয়া তৎপ্রদত্ত শিক্ষায় মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র। সংস্কৃতে এম-এ ও ডি, লিট্, পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতা ও প্রশংসার সহিত সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছে। বর্ত্তমানে সে কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

মুক্তাগাছা—

প্রথম যাত্রা ময়মনসিংহ টাউনে প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলাম। সেই সময়েই মুক্তাগাছা যাই। রাইমোহনদার বাসা হইতে সকাল দশটার মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়া বাস-সার্ভিসে রওনা হইলাম। এগারটার কিছু পূর্ব্বে মুক্তাগাছা পৌঁছিলাম। তখন আমার কাজের সহকর্ম্মী কুমুদিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। সেও আমার সাথে ছিল। মুক্তাগাছা সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান। তাই বিছানাপত্র সুটকেস নিতান্ত অনুরোধ করিয়া একজন অপরিচিত ডাক্তারের ডিস্পেনসারীতে

রাখিয়া, তাড়াতাড়ি স্কুলে চলিয়া গেলাম। তথায় অনুসন্ধান নিয়া সরাসর হেডমাষ্টারবাবুর কামরায় গিয়া প্রবেশ করিলাম। নিজের পরিচয় নিজেই দিলাম। আর তাহার কাছে আমার যাওয়ার উদ্দেশ্যও প্রকাশ করিয়া বলিলাম। আমার কথা-বার্ত্তা শেষ হওয়ার পরেই হেডমাষ্টারবাবু বলিয়া ফেলিলেন,—চেহারা দেখে মনে হয় না আপনি যে বক্তৃতা দিতে পারিবেন। হেডমাষ্টারবাবুর এই প্রকার মন্তব্যে বিচলিত না হইয়া আমি বরং নম্রভাবে বলিলাম—"কর্ম্ম না দে'খে আগেই একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সম্পর্কে এই প্রকার মন্তব্য করা শোভন হয় না, দাদা! দয়াকরে আগে আমাকে বলবার সুযোগদিন, পশ্চাতে কর্ম্ম দে'খে যাহা কিছু বলা সমীচীন নয় কি ? দাদা!" অতঃপর হেডমাষ্টারবাবু মত প্রকাশ করিলেন—স্কুলে উচ্চ শিক্ষিত কয়েকজন শিক্ষক আছেন, আমন্ত্রণ করিলে জমিদার বাড়ীর কেহ হয়তো আসিতে পারেন, তাই এরূপ স্থলে শেষে অপ্রস্তুত হওয়া কি ভাল ? সর্ব্বশেষ আমি এই নিবেদন করিলাম—যখন এসেছি, অতিথিকে বিমুখ করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, দাদা! একান্তই যদি কিছু বলতে না পারি, তাহা হ'লে না হয় একটা হাস্যরসের অবতারণা হবে, এরবেশী কিছুই নয় ত? তাতেও এক প্রকার আমোদ উপভোগ করাই হবে। অতঃপর কি বলা হইবে মোটামুটি আমার নিকট হইতে হেডমাষ্টারবাবু শুনিয়া নিলেন এবং তখনই ক্লাসে ক্লাসে মাষ্টারদের নিকট বক্তৃতা যে হইবে সেই নোটিশ পাঠাইয়া দিলেন।

পূর্ব্বাপর অন্যান্য স্থানে স্কুল সমূহে যেরূপ ভঙ্গীতে বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই ধরণে সমস্ত বলা হইল। বক্তৃতার পরে মৎ-প্রণীত পাকা-রং-প্রণালী পুস্তক হইতে প্রকরণগুলি ছাত্রদের দ্বারা করান হইল। বক্তৃতা ও প্রাক্‌টিক্যাল দেখান শেষ হওয়ার পরেই হেডমাষ্টারবাবু আগ্রহ করিয়া আমাকে সাথে নিয়া তাহার নিজ কামরায় চলিয়া গেলেন। আর উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ধারা উল্টাইলে

মানুষ অমরত্বের সন্ধান পেতে পারে আপনার একথার তাৎপর্য্য কি; বিস্তারিত তাহা শুনিতে চাহিলেন। বক্তৃতার এই কথাতেই তাহার মন সর্ব্বাপেক্ষা তখন বেশী আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাই তিনি বিশেষ করিয়া বলিলেন।

তখন আমি ক্লান্ত, তাই একটু বিশ্রামের পরে বলা হবে বলিয়া সময় নিলাম। অতঃপর হেডমাষ্টারবাবু আমাকে ও আমার সহকর্মীকে নিয়া তাহার বাসায় গেলেন। বাসায় পৌঁছার পরেই আমাদের জলযোগের ব্যবস্থার জন্য পাচককে বলিলেন। আর আমাদিগকে রাত্রিতে তাহার বাসায় থাকার অনুরোধ করিয়া রাখিলেন। হেডমাষ্টারবাবুর পরিবার তখন তথায় ছিল না। তাই পাচককেই যোগাড়যন্ত্র করিয়া জলযোগের সব ব্যবস্থা করিতে হইল। পরিবার উপস্থিত না থাকায় আমাদের বাসায় অবাধ চলাচল করার ও খোলাখোলিভাবে কথাবার্ত্তা বলার সুযোগ হইল। জলযোগের পরেই কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল। তদবস্থায় হেডমাষ্টারবাবু ঘর হইতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বারান্দায় একখানা সিমেন্ট নির্ম্মিত স্থানে দেখাইয়া বলিতে থাকিলেন রাত্রিতে ঐ বেদীতে বসিয়া তিনি প্রাণায়ামাদি করিয়া থাকেন। তিনি দুইবৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত এই অভ্যাস করিয়া আসিতেছেন কিন্তু অনুভবযোগ্য কোন ফল না পাওয়াতে এখন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। কোথায় সদ্‌গুরু পাবেন এই আকাঙ্খা এখন তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি কয়েকদিন যাবত রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, প্রাণ বড়ই অস্থির, আবেগের তীব্রতায় কখন পূর্ব্বাগত যুগ-পুরুষ রাম, কখনও কৃষ্ণ, কখনও রামকৃষ্ণ, কখনও মহম্মদ-যীশুর উদ্দেশ্য করিয়া আকুল প্রার্থনা করিয়া আসিতেছেন—তাঁহারা তাহার সদ্‌গুরুলাভে সহায় হউন। এই সমস্ত বলার সময়ে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম হেডমাষ্টারবাবুর চক্ষুদ্বয় ভাবে ছলছল আর অশ্রুপূর্ণ। তখন আমি তাহাকে ভরসা দিয়া বলিলাম—"হয় তো তাহারা আপনার কাতর প্রার্থনা শুনেছেন। হয়তো আমাদ্বারা আপনার সেই মনস্কামনা

পূর্ণ হতেও পারে। পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের বার্ত্তাবহ হ'য়ে আমি এখানে এসেছি।"

আপনি "সৎনাম" গ্রহন করুন, ঠিক ঠিক অভ্যাস করলে স্বল্পকাল মধ্যেই এই নামের মহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তখনই তিনি "নাম" নিতে বসিলেন। আমিও "নাম" দিতে উদ্যত হইলাম। তন্মুহূর্ত্তে হেড মাষ্টারবাবু বলিলেন "আমি দীক্ষা নিতে পারি, আপনাকে গুরু স্বীকার করে তা' কিন্তু হবে না। হয় রামকৃষ্ণদেব, নয় অন্ততঃ বিবেকানন্দ, এই রূপ একজন গুরু হওয়া চাই।" তখনই আমি বলিলাম "আমি বার্ত্তাবহ মাত্র, শ্রীশ্রীঠাকুরই ইষ্টগুরু। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানা ছোটোখাটো ফটো দেখাইয়া বলিলাম ইনিই গুরু—শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ হতে কোন অংশে ন্যূন নহেন, বরং উঁহাদের উভয়ের যাহা কিছু শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যেই পাবেন কিম্বা তদপেক্ষা কিছু বেশী পেতে পারেন ইহা অত্যুক্তি নয়। আমি ভৃত্যমাত্র। মনে করুন আপনার ডাক তাঁ'রা শুনেছেন, ব্যাকুলতাই হয়ত অপ্রত্যাশিতভাবে আজ আমাকে এখানে এনে হাজির ক'রেছে। অতঃপর আর কোন দ্বিধা না করিয়া হেডমাষ্টারবাবু দীক্ষা নিলেন। তিনি যে ঘরে থাকেন সেই ঘরেই অপর এক চৌকিতে আমার রাত্রিতে শোয়ার ব্যবস্থা করিলেন। শেষরাত্রিতে তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া আমার সাথে ধ্যান করিতে বসাইলাম। আর প্রাতে বিনতি-প্রার্থনাও করান হইল। দীক্ষার পরেও তিনি আমাকে কয়েকদিন রাখিয়া দিলেন। ইত্যবসরে জমিদার পরিবারের কোন কোন ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় করাইলেন। এই থাকার ফলে প্রথমে কয়েকজন ছাত্র, তৎপরে ঐ স্কুলের শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র (বর্ত্তমানে প্রতিঋত্বিক) দীক্ষা লয়। ইহার পরেই জমিদার যতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী দীক্ষা নিলেন। উঁহাদিগের উদ্দীপ্ত করার উদ্দেশ্যে হেডমাষ্টার সুরেনদার বাসায় প্রথমে এক অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইল। ইহা হইতেই মুক্তাগাছা সৎসঙ্গ অধিবেশনের সূত্রপাত। ইহাই শেষকালে জমিদার

যতীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর বাড়ীতে স্বামী সৎসঙ্গ অধিবেশনে পরিণত হইয়াছিল। যতীনদার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহা নিয়মিত ভাবে চলিয়াছিল। এই ইতিবৃত্তে মুক্তাগাছার বিবরণী মধ্যে হেডমাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত আর জমিদার যতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। আগে সুরেনদার সম্পর্কে লেখা হইল, তৎপশ্চাতে যতীনদার বিষয় দেওয়া গেল।

দীক্ষার কিছুদিন পরেই সুরেনদা শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন উদ্দেশ্যে হিমাইতপুর আশ্রমে গিয়াছিলেন। ঐ সময়েই তাঁহার স্ত্রীকেও জলপাইগুড়ী হইতে আশ্রমে আনাইয়া দীক্ষা দেওয়াইয়া ছিলেন। আশ্রম হইতে মুক্তাগাছা প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই সুরেনদা আমার বাড়ীর ঠিকানায় পত্র দেন। তাহাতে অকপট ভাবে তিনি লিখিয়াছিলেন—অবিদ্যার মোহে গর্ব্বিত হইয়া প্রথম সাক্ষাতের সময়ে আমি আপনাকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়াছিলাম এবং তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সহিত কথাবার্ত্তাও বলিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমি এখন অনুতপ্ত!

আপনি যে পরম বিদ্যা লাভের জন্য আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তজ্জন্য আমি চির-ঋণী। এই "নাম" নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করিলে যে দ্রুত ফল পাওয়া যায়—তাহা ধ্রুব সত্য, এখন বুঝিতেছি। আপনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা যে বাস্তবে সত্য—এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নাই। আর শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা কি লিখিব সমস্ত ভাবভাষার উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধে তিনি, এমন মনোমুগ্ধকর প্রেমময় মূর্ত্তি দ্বিতীয়টী আর দেখি নাই। জানেন, দীক্ষার সময়ে ভাবাবস্থার ফটোখানা দেখিয়াই কত মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আর জীবন্ত তাঁহাকে দর্শনমাত্র যে কী হইয়াছিল তাহা লেখায় ব্যক্ত করা যায় না—বোঝে প্রাণে বোঝে যায়।" এখানেই লেখনী নিস্তব্ধ। এখন অন্য কথা লিখিতেছি—বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে আমি ঢাকা যাইতেছি; দয়া করে আপনি সেই সময়ে ঢাকার বাসায় উপস্থিত থাকিলে সুখী হব। তখন আমার বাবা ও মাকে "নাম" দেওয়ার ইচ্ছা।
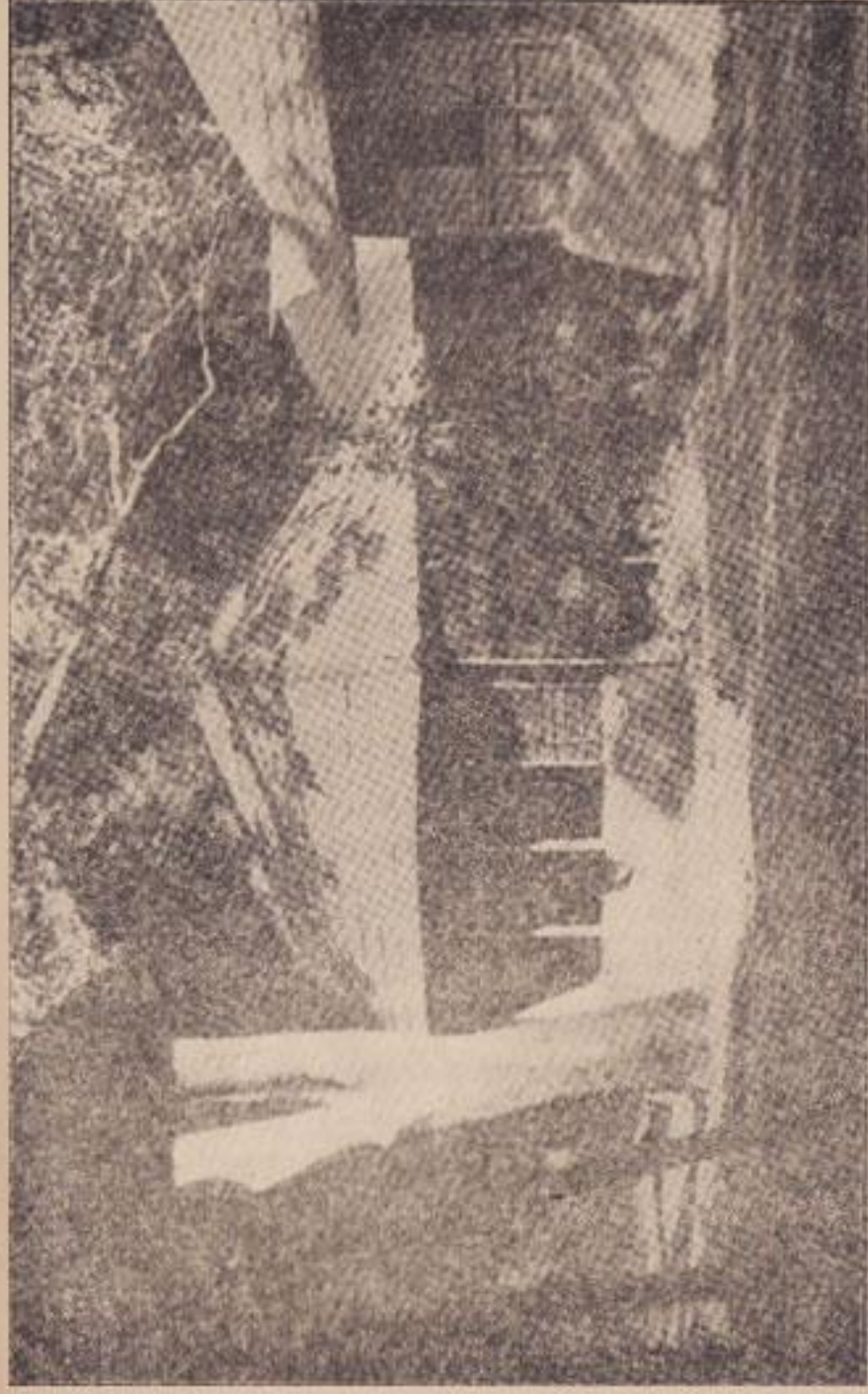
ভক্ত কিশোরী মোহনের বাড়ীতে ভাব সমাধির একটি দৃশ্য।

বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে তিনি ঢাকা আসিয়াছিলেন। আমিও তাঁহার পত্র পাইয়া ঢাকা গিয়াছিলাম। তৎসময়ে তাঁহার মা দীক্ষা নিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধপিতা দীক্ষা নিতে রাজী হইলেন না। অনেক যাজন করা হইল এবং আমার কথা সবই যে যুক্তিপূর্ণ ইহাও তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার এক বদ্ধমূলধারণা—একজন্মে কিছুই হইতে পারে না; সিদ্ধিলাভ করিতে বহুজন্মের সাধনা প্রয়োজন। তাই বৃদ্ধ ওকালতি ছাড়িয়া দিয়া তখন কেবল গীতাপাঠ, স্তবস্তুতি, ন্যাস-প্রাণায়াম ইত্যাদি অনুষ্ঠানেই রত ছিলেন। তখন বৃদ্ধের বয়স পয়ষট্টির ঊর্দ্ধে। ছেলেদের মধ্যে সুরেনদাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সুরেনদা নিজের অনুভূতি ইতকাল মধ্যে যাহা হইয়াছিল তাহাও তাঁহার বাবাকে বলিয়াছিলেন এবং নাম নেওয়ার জন্য অনেক আবদারও করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের আগাগোড়া একই কথা—জন্মজন্মান্তর তপস্যা ভিন্ন এত অল্প সময়ে কিছুতেই হওয়া সম্ভবপর নয়। পিতার একান্ত মঙ্গলকামী হইয়া সুরেনদা অতঃপর তাঁহাকে হিমাইতপুর আশ্রমে নিয়াছিলেন। ঐসঙ্গে তাঁহার মাতৃদেবীও শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিয়া বৃদ্ধবাবাজী তৃপ্তিও পাইয়াছিলেন! যতদিন আশ্রমে ছিলেন অধিকাংশ সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকটেই থাকিতেন দেখিয়াছি। সুরেনদার একান্ত আগ্রহে মহারাজ, কিশোরীদা, গোঁসাইদা ও আশ্রমস্থ অন্যান্য সৎসঙ্গীগণও যথেষ্ট যাজন করিয়া ছিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। বৃদ্ধের সেই এক বদ্ধসংস্কার।—তপস্যা জন্মজন্মান্তরের কাজ, এত সহজসাধ্য কখনও হইতে পারে না। এই সংস্কার নিয়াই বৃদ্ধ।—বাবাজীর জীবন অবসান হইয়া গেল। একদিকে বৃদ্ধবাবাজীর কথা ঠিকই—জন্মজন্মান্তরের নিতান্ত সুকৃতি না থাকিলে জীবন্ত সদ্গুরুকে যে ধরা যায় না, সাক্ষাৎ দর্শন হইলেই বা কী হইবে? তাঁকে ধরা বড়ই সমস্যার বিষয়। প্রত্যেকই জানেন—মহাধনুর্দ্ধর পার্থ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আবাল্যসাথী, কেবল তাহাও নয়, নিতান্ত প্রিয়সখা। পরস্পর মিলামিশা, বাক্যালাপ প্রতিনিয়তই ছিল, তৎসত্ত্বেও—ইষ্ট শ্রীভগবান—তিনিই পুরুষোত্তম—তাঁহাকে

আপ্ত করাই ভগবান-প্রাপ্তি—এই বোধ আনার জন্ত অষ্টাদশ অধ্যায়পূর্ণ এক বিরাট গীতার সৃষ্টি। এত করার পরে অর্জ্জুনের মোহ মোচন। আর পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দীর্ঘ কয়েকবৎসর সঙ্গ লাভের পরেও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ন্তায় মহাযোগী পুরুষকেও কত দ্বিধা, কত সংশয় অতিক্রম করিয়া তদন্তর তাঁহাকে ইষ্ট-পুরুষ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাই এই বিষয় যেমন সহজ—তেমনই গুরুতর। ইতিহাসই সাক্ষ্য। শ্রীরামচন্দ্র অবধি কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু মহম্মদ-চৈতন্ত-রামকৃষ্ণ কতজনই আসিলেন। জীবন্ত অবস্থায় একান্ত ভাগ্যবান যাহারা তাহারাই ধরিতে পারিয়াছিল; আর যাহারা হতভাগ্য দেখিয়াও বুঝিতে পারে নাই। সুরেনদা সম্পর্কে যাহা বলা হইতেছিল—দেখিয়াছি প্রত্যেক ছুটীতেই তিনি আশ্রমে চলিয়া আসিতেন আর ছুটী অবসানে মুক্তাগাছা চলিয়া যাইতেন। আশ্রমে যাত্রীদের থাকার তৎকালে কোন পৃথক ঘর ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীর বাহিরের দিকে যে দু'একখানা ঘর ছিল, তাহাতেই সমাগত ভক্তগণ থাকিতেন। ছুটী উপলক্ষে আশ্রমে গিয়া কোনও অসুবিধা না হয় সেই উদ্দেশ্য হইতেই সুরেনদা আশ্রমে একখানা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুক্তাগাছা যে সমস্ত দীক্ষা হইয়াছিল এবং তৎসময়ে সৎসঙ্গের ভাবধারা তথায় যে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার মূলে সুরেনদার ঐকান্তিক ইষ্টানুরক্তি, আপ্রাণ যাজনশীলতা ও সকলের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ উদার ব্যবহার। সুরেনদার কর্ম্ম কেবল মুক্তাগাছাই সীমাবদ্ধ ছিল না; আশেপাশে অনেক স্থানেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি যাজনের সহায়তা করিতে যাইয়া থাকিতেন। ময়মনসিংহ টাউনেও এইজন্ত কয়েকবার গিয়াছিলেন। তথাকার যে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে যখনই আমি তাঁহাকে চাহিয়াছি সংবাদ দিলেই যথাসময়ে তিনি আসিয়া যোগদান করিতেন। এইভাবে জামালপুরটাউনেও কোন কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত আগাগোড়া তিনি সমউদ্যমে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠামূলক যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। মৎপ্রণীত চরম-যুগধর্ম্ম পুস্তকের তিনি

প্রকাশক ছিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্তির আট কি দশ বৎসর পরে সুরেনদা দেহত্যাগ করেন।

সুরেনদার নিকট হইতেই যাহা কিছু শোনার পরে জমিদার যতীন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী আমাকে তাহার বাড়ীতে যাওয়ার আহ্বান করেন। অতঃপর বাড়ীতে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সুরেনদা আমার সাথে ছিলেন। দীক্ষা, কুলগুরু, কুলাচার, বীজতত্ব, শাক্ত-বৈষ্ণব-সাধনা, জীবন্ত যুগ-পুরুষের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অনেক আলোচনাই যতীন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরীর সহিত তৎসময়ে হইয়াছিল। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া আগে জানিয়া নিলেন। আমিও যথাসাধ্য যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়া তাহার প্রশ্নের সমাধান করিলাম। অতঃপর এই সাব্যস্ত হইল আগামী দিন তিনি দীক্ষা নিবেন। তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি আমাকে তাহার বাড়ীতে নেওয়াইয়া দীক্ষা নিয়াছিলেন। দীক্ষাকার্য্য নিষ্পন্ন হওয়ার পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করা সম্পর্কে তিনি কথা উত্থাপন করেন। তাহার ইচ্ছা মুক্তাগাছা নিজ বাড়ীতে আনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিতে পারিলে তবে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। তখন তাহাকে জানান হইল শ্রীশ্রীঠাকুর এইভাবে কখনও কোথা যান না, আশ্রমে গিয়াই দর্শন করিতে হইবে। যতীনদা এই কথার আর কোনও প্রতিবাদ না করিয়া আশ্রমে গিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন করিবেন এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। তখনই পঞ্জিকা দেখা হইল এবং তদ্দৃষ্টে দিন-তারিখও স্থির হইল; দশমীর পরেই বিজয়া-যাত্রা করিবেন বলিয়া দিলেন। আর সেই সময়ে আমাকেও তাহার সাথে যাইতে হইবে এবং সময়মতে পত্র দিবেন—ইহাও জানাইয়া রাখিলেন। আমিও তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। যখন এই সম্পর্কে কথাবার্ত্তা হয় তখন ভাদ্র মাস শেষ হইয়া আসিয়াছে, পূজার মাত্র মাসাধিককাল মধ্যে সময় আছে। পরিকল্পনা অনুসারে যতীনদা যথাসময়ে আমাকে পত্র দিয়াছিলেন এবং বিজয়া-যাত্রা করিয়া মুক্তাগাছা হইতে আমাকে সাথে

নিয়া আশ্রমেও আসিয়াছিলেন। তাহার সাথে পাচক-ভৃত্য সবই ছিল। যে কয়দিন আশ্রমে ছিলেন স্বকীয়ভাবেই আহারাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আশ্রমে দুইদিন এইভাবে অতীত হইল। তৃতীয় দিন প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া যতীনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট এই আকাঙ্খা প্রকাশ করিলেন, যে তাহার স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীশ্রীঠাকুর যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নিজেকে পরম ভাগ্যবান মনে করিবেন। তাহার ঐকান্তিক আগ্রহে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহা অনুমোদন করিলেন। তখনই সেই ভাবে সব ব্যবস্থা হইল। যতীনদা নিজেই রান্না আরম্ভ করিলেন, আর পাচক-ভৃত্য সমস্ত যোগান দিতে থাকিল। এমন তৎপরতার সহিত যতীনদা রান্না করিতে থাকিলেন যে যথোচিতসময়ে বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জন ও নানা প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া গেল। অতঃপর যথা সময় মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যাহ্নকৃত্য নিষ্পন্ন হইল। তদন্তর তিনি নিজে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। আমারও ব্যবস্থা ওখানে ছিল, আমিও প্রসাদ পাইলাম। বিবিধ প্রকার উপাদেয় ব্যঞ্জনাদি ও উৎকৃষ্টতম রকমের নানাপ্রকার মিষ্টসামগ্রী প্রস্তুত সম্পর্কে যতীনদা অতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন। তাহার স্বহস্তকৃত বিবিধ প্রকার মিষ্টসামগ্রী ও নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি সমন্বিত পক্কান্ন গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ পরিতৃপ্ত হন। এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার পরে যতীনদার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনিও এই সুযোগে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গিয়া নিজের এই মনোভাব ব্যক্ত করিলেন—যত দিন তিনি আশ্রমে আছেন তাহার ওখানে দুই বেলাই আহারের ব্যবস্থা থাকিবে এবং নিজ হস্তে তিনি সমস্ত খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্নচিত্তে তাহার এই প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন। যে কয়েকদিন তিনি আশ্রমে ছিলেন তাহার ওখানেই প্রতিদিন শ্রীশ্রীঠাকুর আহার করিতেন। অধিকন্তু আমার ব্যবস্থাও যতীনদার ওখানে ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন উপলক্ষে যতীনদা অনেকবারই আশ্রমে আসিয়াছিলেন। কোন কোন সময়ে একক, কোন সময়ে সস্ত্রীক ও কখন কন্যাও সাথে ছিল। আশ্রমে দীর্ঘদিন থাকার উদ্দেশ্যে যখন আসিতেন তখন তাঁবু নিয়া আসিতেন এবং তাঁবুতেই থাকিতেন। তৎকালে শ্রীশ্রীঠাকুরেরও আহারের ব্যবস্থা তাহার ওখানে হইত। দীক্ষা গ্রহণের পরে তিনি দশ কি বার বছর জীবিত ছিলেন। বিশ্ববিজ্ঞানের সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থে তাহার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীনদার আকস্মিক মৃত্যু এক মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার। মোটর দুর্ঘটনায় ১৩৪১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাহার মৃত্যু হয়। সেই শোকাবহ মৃত্যুর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল। ইষ্টার্থে এতখানি করা সত্ত্বেও কেন এইরূপ ভ্রম হইল তাহা বিশ্লেষণের জন্যই এই বিষয়ের অবতারণা।

বহুদিন পরে কলিকাতা হইতে মুক্তাগাছা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ঈশ্বরদি নামিয়া অকস্মাৎ একদিন যতীনদা হিমাইতপুর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘকাল পরে তাহাকে পাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর অতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। দুই চার দিন তিনি আশ্রমে থাকিলে যে বেশ আনন্দে কাটানো যাইবে এই মন্তব্যও শ্রীশ্রীঠাকুর তখন করিলেন। যতীনদার সাথে ভাড়াটীয়া একখানা ট্যাক্সি আছে শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর উহা ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলিলেন। যতীনদা কিন্তু সেই কথায় বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। অপরন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভারকে রাত্রি দশটার মধ্যে আসার কথা তিনি বলিয়া দিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তিনি ব্যক্ত করিলেন—রাত্রিতেই তাহার রওনা হওয়া একান্ত প্রয়োজন, আগামীদিন যেভাবেই হউক তাহাকে মুক্তাগাছা উপস্থিত থাকিতেই হইবে নতুবা তাহার যথেষ্ট ক্ষতি হইবে। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর এই বলিয়া অভয় দিলেন—পরমপিতার দরবারে থাকিলে কারো কোন ক্ষতি হইতে পারে না; বিশেষ ঠেকা হইলে বরং আগামীদিন সকালে আশ্রমের ট্যাক্সিতে তাহাকে ঈশ্বরদি পৌছাইয়া দেওয়া হইবে। এত বলা সত্ত্বেও যতীনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না। অতঃপর

অন্যান্য কথা যাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বলা দরকার ছিল তাহা শেষ করিয়া জননীদেবীর নিকট গেলেন। মা'র নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সৎসঙ্গীদিগের সহিত দেখাসাক্ষাৎ সমাপন করিলেন। ইহাতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। অনন্তর আহারাদি শেষ করিয়া পুনরায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিলেন। যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া তখন আসিলেন। কথাবার্ত্তায় রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। এদিকে ট্যাক্সিও আসিয়া উপস্থিত। অতঃপর যতীনদা প্রণাম করিতেই শ্রীশ্রীঠাকুর চমকিয়া উঠিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সত্যই কি তিনি যাইতেছেন? যাওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়াত্মক উত্তর পাইয়া, বিলম্ব ঘটানের অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীঠাকুর আরও অন্যান্য কথার সঙ্গে হুকার নলের কথা উত্থাপন করিলেন। যতীনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হুকার নল কলিকাতা হইতে আনিয়া দিতেন। তাই উহা কলিকাতায় কোন ঠিকানায় পাওয়া যায় তাহা জানিতে চাহিলেন। ডাঃ হরিপদদা তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাহাকে ঠিকানা লিখিয়া রাখিবার জন্য যতীনদা বলিলেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যক্ত করিলেন—ঐ ভাবে ঠিকানা দিলে চলিবে না, ভবানীর নিকট পাকাখাতা আছে তাহাতে লিখিয়া রাখিতে হইবে। তখনই ভবানী সাহা ক্যাসিয়ারের অনুসন্ধানে লোক পাঠান হইল।

ভবানী সাহা তখন বাসায় চলিয়া আসিয়াছে। আহারান্তে সেও শুইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থা হইতে তাহাকে ডাকিয়া তুলিয়া আশ্রমে আনা হইল। অনন্তর পাকাখাতায় ঠিকানা লেখা হইল। এই সমস্ত কাণ্ডকারখানায়ও অর্দ্ধঘণ্টার উপরে চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশ্য যতীনদার যাওয়া যাতে বন্ধ থাকে। যতীনদা কিছুতেই যখন ক্ষান্ত হইলেন না, তখন রওনা হইবার মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে এই সতর্ক করিয়া দিলেন—নিয়তি কিন্তু নিয়ে যায়, সাবধানে যেন যাওয়া হয়, লক্ষ্য যেন থাকে কোন প্রকার অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সমস্ত বাণী

শুনিয়াও যতীনদা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিলেন না। পরন্তু নিজের খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া রওনা হইলেন। শুনিয়াছি—ঈশ্বরদি হইতে চারি-পাঁচ মাইল দূরে নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে মোর ফিরাইবার প্রাক্কালে ট্যাক্সি পথিপার্শ্বে অবস্থিত একটী খেজুর গাছের সহিত আকস্মিক সংঘাতে উল্টাইয়া যায়। ড্রাইভার তৎপরতার সহিত লম্ফ দিয়া সরিয়া পড়াতে কোন প্রকারে রক্ষা পায়, আর যতীনদা গাড়ীর মধ্যেই গুরুতর আঘাতে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। ঘটনাস্থল হইতে পাবনা হাসপাতালে আনার কয়েকঘণ্টা পরেই তিনি মারা যান। তাহার পরিচারক সুধীর সাথে ছিল, সেও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। কিন্তু আঘাত গুরুতর হইয়াছিল না বলিয়া সে বাঁচিয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ সত্বেও যতীনদা কেন এইভাবে চলিয়া গেলেন, কেন এ ভ্রান্তি হইল এবং তাহার সূত্রপাত কোথায়, ইহা গভীর মনস্তাত্বিক! দীক্ষা সম্পর্কেও তাহাকে এক ভ্রম পাইয়া বসিয়াছিল। আশ্রমে আসিয়া তিনি দেখিলেন—মহারাজ সবচেয়ে সম্মানের পাত্র। যাহারা আসেন তাহারা সকলেই তাঁহাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অধিকন্তু দীক্ষা সম্পর্কে মহারাজ আশ্রমে সর্ব্বময়কর্ত্তা। এই সমস্ত দেখিয়া এবং তাহার সম্পর্কে শুনিয়া যতীনদার ধারণা হইল যে, মহারাজের কাছে দীক্ষা নিলে তাহার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন।

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও মহারাজ তাহাকে দীক্ষা দিলেন না। বরং আরও বুঝাইয়া দিলেন 'নাম' পাওয়ার সাথে দীক্ষা হইয়া গিয়াছে সুতরাং দ্বিতীয়বার তাহা হইতে পারে না। তবে কোন বিষয় জানার যদি একান্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া শুনিয়া যাচাই করিয়া নেওয়া ভাল। অতঃপর মহারাজ তাহাকে নামের মাহাত্ম্য, ধ্যান ও অভ্যাস সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া শুনাইলেন।

এই ঘটনার পর হইতে আশ্রমে "নাম-ঝালাই"—এই এক হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। যতীনদার পক্ষাবলম্বী কয়েকজন এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। অবশ্য আশ্রমের কোন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই সংশ্রবে ছিলেন না। তৎকালে বাহির হইতে দীক্ষা নিয়া কোন নূতন লোক আশ্রমে আসিলেই "নাম-ঝালাই" নিয়া ঐ সমস্ত লোক তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত। দৈবাৎ এই সময়ে ব্রহ্মদেশ হইতে ব্রজেন্দ্র নাথ চাটার্জ্জি আর যোগেন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি এডভোকেট এক যোগে শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন উদ্দেশ্যে হিমাইপুর আশ্রমে আসেন। তখন ঐ ভাবাপন্ন কেহ কেহ "নাম-ঝালাই" ব্যাপার নিয়া তাহাদের পিছনেও লাগিয়াছিল। তাহারা ঐ সব লোকের সহিত কোন প্রকার বাদানুবাদ না করিয়া সরাসর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট চলিয়া আসেন এবং 'নাম-ঝালাই' সম্পর্কে কথা উত্থাপন করেন। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন—"নাম পে'লেই দীক্ষা, তা' আশ্রমেই হউক বা বাহিরেই হউক, তা'তে কিছু আসে যায় না, যার উপর আদেশ আছে এমন কেহ দিলেই হ'ল, ফিরে আর দীক্ষা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর এই প্রকার মীমাংসা দেওয়ার পর হইতেই "নাম-ঝালাই" সংক্রান্ত গোলমাল থামিয়া যায়।

অনন্তমহারাজ পরলোক গমনের পর যখন "চক্রফটো" সহ ধ্যান প্রবর্ত্তিত হয় সেই সময়েও অন্য প্রকার এক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহা হইল এই—"পূর্ব্বের সমস্ত দীক্ষা বাতিল হইয়া গিয়াছে, আর চক্রফটোর সহিত নূতন অভ্যাস যাহা দেওয়া হইতেছে তাহাই আসল দীক্ষা।" ব্রহ্মদেশ হইতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে আমি এই সংবাদ অবগত হই। কম্পাউণ্ডার চারুচন্দ্র সরকার সর্ব্বপ্রথম আমাকে এই সম্পর্কে সবিশেষ বলেন। তাহার এই সম্পর্কে জানাইবার কারণও ছিল। তৎকালে দীক্ষার যাবতীয় রেকর্ড লেখার ভার ছিল চারুদার উপর। সেই কারণে ব্রহ্মদেশের কতগুলি দীক্ষাপত্র রেকর্ড করার জন্য তাহার নিকট গিয়াছিলাম।

সেই সূত্রেই তিনি আমাকে এই সমস্ত বিষয় জানাইয়াছিলেন। শেষকালে তিনি আমাকে ইঁহা বলিয়া দিলেন যে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদার নিকট গেলেই সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যাইবে। অতঃপর আমি শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদার নিকট গিয়া এই প্রসঙ্গে কথা উত্থাপন করিলাম। তাহাতে তিনি এই মাত্র উত্তর দিলেন —পূর্ব্বের সমস্ত দীক্ষা বাতিল হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে চক্রের সহিত যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহাই আসল দীক্ষা। বাস্তবিক সমাধান পাওয়ার জন্য আমি অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট চলিয়া আসিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃ-মন্দিরের উত্তরধারের খালি জায়গায় ছোট বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। আমার কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণদাও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের দুইজনের বক্তব্য শুনিয়া তন্মুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীঠাকুর এই সমাধান করিয়া দিলেন—"আগের দীক্ষাই মূলদীক্ষা, চক্রের সহিত যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা এক প্রকার প্র্যাকটিস মাত্র।" অতঃপর আরও নির্দ্দেশ দিলেন—আগে যিনি যাহাকে দীক্ষা দিয়াছেন তিনিই তাহার দীক্ষাদাতা ঋত্বিক, এখন চক্রের অভ্যাস যিনিই দিয়া থাকুন।"

অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ ক্রমে সমস্ত রেকর্ড সংশোধিত হয়। অবশ্য বর্ত্তমানে এই প্রকার প্রশ্ন উঠিবার কান কারণ নাই, যেহেতু এখন সমস্ত দীক্ষাই চক্রের সহিত দেওয়া হইয়া থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল, ভবিষ্যতে আর না হয় তাই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। ইষ্ট-পুরুষের কথার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া চলার হেতুতে ও ইষ্ট-পুরুষের অবিদ্যমানে নানা প্রকারের কল্পিত ব্যাখ্যা হইতে এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই কত শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কূলকিনারা নাই। তাই সপ্তার্চ্চিতে বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ আছে—

"তথাগতগণের অগ্রণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তম পূর্ব্ব-পূর্ব্বগণের পূরণকারী বিশিষ্টবিশেষবিগ্রহ।

তদনুকূল শাসনই অনুসর্ত্তব্য—তদিতর কিছুই নহে।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আশ্রমের দীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ও সৎসঙ্গীদিগের সহিত চিঠিপত্র আদানপ্রদান দ্বারা যোগাযোগ সংরক্ষণের সম্পূর্ণ ভার তৎকালে অনন্তমহারাজের উপর ছিল। এতদ্ব্যতীত পূজনীয় গোঁসাইদা ও শ্রদ্ধেয় দুর্গানাথ সান্ন্যালের উপরও দীক্ষা দেওয়ার আদেশ ছিল। গোঁসাইদার যাজনক্ষেত্র ছিল, পাবনা টাউন আর তন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থান। এতদ্ব্যতীত নদীয়া জেলার কুষ্টিয়াসদর ও উক্ত সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত যাবতীয় স্থান। একান্ত প্রয়োজন হইলে কখন কখন দূরদূরান্তর যাইতেন। আর দুর্গানাথদা অতিশয় শিষ্টশান্তলোক, দূরে কোথাও যাইতেন না, গ্রামের আশেপাশেই যাজন করিতেন, তাই তাহাদ্বারা দীক্ষাকার্য্য যৎসামান্য হইয়াছিল। জননীদেবী দীক্ষা দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি অতি কদাচিৎ দীক্ষা দিতেন। নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া কেহ বিশেষ ভাবে ধরিলে মা দীক্ষা দিতেন, নচেৎ প্রায়ই দিতেন—না। জননীদেবী কর্ত্তৃক দীক্ষার এক অসুবিধাও ছিল, দীক্ষান্তে তিনি হুজুর মহারাজের ধ্যানের কথা বলিয়া দিতেন, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে কিছুই বলিতেন না। নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তখন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আকার-ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত আমার সংযোগ হওয়ার পর হইতে দেশদেশান্তরে যাজন একক আমাকেই করিতে হইয়াছিল। এই কারণে তৎকালে বহির্দ্দেশের যত দীক্ষা আমার দ্বারাই হইয়াছিল। এইকাল পর্য্যন্ত একক আমাকেই সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম প্রদেশ ও সমগ্র ব্রহ্মদেশে যাজন ও দীক্ষাকার্য্য যুগপৎ চালাইতে হইয়াছিল। তৎকালে ঋত্বিক, প্রতিঋত্বিক, অধ্বর্য্যু ও যাজক ইত্যাদি কোন পদের সৃষ্টি হয় নাই। আশ্রমস্থ কর্ম্মীগণের মধ্যে আমার পূর্ব্বাগত শ্রদ্ধেয় সুশীলচন্দ্র বসু। তিনি ছিলেন তৎকালে প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু দীক্ষা দেওয়ার কোন আদেশ তখনও তাহার উপর ছিল না। অপর এক বিশেষ আশ্রমকর্ম্মী ছিলেন নফরচন্দ্র

ঘোষ। তৎকালে সৎসঙ্গী ও অভ্যাগত যাহারা শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শনে আসিতেন তাহাদের যত্ন নেওয়া, খাওয়া ও থাকার সমস্ত ব্যবস্থা করার সম্পূর্ণ ভার ছিল নকুরদার উপর। "আনন্দবাজার" সৃষ্ট হওয়ার পরে উহার সম্পূর্ণ ভারও নকুরদার উপর ন্যস্ত ছিল। তাহার জীবদ্দশার শেষমুহূর্ত পর্য্যন্ত তিনি আনন্দবাজারের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ও অম্লান বদনে অনবরত খাটিয়াছেন এবং ক্রমাগত সৎসঙ্গী ও অভ্যাগতদিগের আপ্রাণ সেবা করিয়াছিলেন। তৎকালে সৎসঙ্গের ডিসপেন্সারীতে কম্পাউণ্ডার ছিলেন চারুচন্দ্র সরকার। তিনিও জীবিত থাকা পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ইষ্টার্থে আগাগোড়া উদারচিত্তে সেবা করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমে আমি হরিদাস ভদ্রকেও দেখিয়াছিলাম। সে তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বাড়ীর জমিজমাসংক্রান্ত কাজ দেখিত, আর খাজনা ও শস্যাদি রায়তদিগের নিকট হইতে আদায় করিত। যৎকৃত যাজন ও দীক্ষাকার্য্য আরম্ভের তিন কি চারি বৎসর পরে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সৎসঙ্গে যোগদান করেন।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, অনন্ত মহারাজ ১৩৪১ সনের মাঘমাসে পরলোক গমন করেন। তাহার দেহত্যাগের দুই কি তিন বৎসর পরে ঋত্বিক, প্রতিঋত্বিক, অধ্বর্য্যু ও যাজক ইত্যাদি কর্ম্মপদের সৃষ্টি এবং তখন হইতেই পাঞ্জা দেওয়ার বিধিব্যবস্থা। আর আমাদের সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের বক্তঃ আদেশই ছিল একমাত্র পাঞ্জা। চক্রকটোসহ ধ্যান প্রবর্ত্তিত হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব্ব বর্ণিত যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ নিরাকরণ হয় শ্রীশ্রীঠাকুরকৃত ঐ মীমাংসা হইতে। অতঃপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুসারে দীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড সংশোধিত হয়। কারণ তৎকালে বাহির হইতে কোন সৎসঙ্গী আসিলেই তাহাকে চক্রের সহিত এই অভ্যাস দেওয়া হইত। সুতরাং যিনি ঐ অভ্যাস দিতেন তখন তাহারই নাম দীক্ষাদাতা ঋত্বিকের স্থলে সৎসঙ্গের জেনারেল রেজিষ্টারী খাতায় রেকর্ড হইত। কাজে কাজেই পূর্ব্ব দীক্ষাদাতার নাম বর্জ্জন হইয়া

তৎস্থলে অন্য ঋত্বিকের নাম রেকর্ড হইত। তাই অনতিবিলম্বে রেকর্ড সংশোধন হওয়ারও একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—মহারাজের মৃত্যুর পরে প্রথম চক্রের ধ্যান ও শবাসনের অভ্যাস, তাহার কিছুকাল পরে স্বস্ত্যয়ণী, তৎপরেই ইষ্টভৃতির প্রচলন। এই সমস্ত ব্যাপার যখন আশ্রমে সুরু হয় তৎকালে আমি ব্রহ্মদেশে। যোগেন্দ্রনাথ হালদার মাষ্টারের নিকট হইতে তথায় আমি এই সমস্ত সংবাদ জ্ঞাত হই।

তিনি ছুটী উপলক্ষে ঐ সময়ে দেশে আসিয়াছিলেন। ঐ নূতন অভ্যাস তখন তিনি আশ্রম হইতে গ্রহণ করেন। রেঙ্গুন যাওয়ার পরেই তাহার নিকটে শুনিতে পাইলাম চক্রফটো অন্যকে দেখান নিষিদ্ধ, এমন কি পুরান সৎসঙ্গীদিগের মধ্যে যাহারা এই অভ্যাস গ্রহণ করেন নাই তাহাদিগকেও উহা দেখান যাইতে পারে না। এই সমস্ত ভাব প্রকাশ করাতে আমি আর এই সম্পর্কে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। অনন্তর একদিন যোগেনদা আমাকে তাহার বাসায় নিয়া গেলেন এবং আমি তাহার দীক্ষাদাতা এই কথা বলিয়া আমাকে ঐ ফটো দেখাইলেন। কিন্তু অভ্যাস সম্পর্কে তাহার সহিত কোন কথা হইল না। আমিও ইচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত বিষয়ে নিবৃত্ত রহিলাম। অনন্তর ব্রহ্মদেশ হইতে দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট হইতে আমি এই অভ্যাস প্রাপ্ত হই।

মুক্তাগাছার যতীন আচার্য্যের আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, সেই সূত্রেই সৎসঙ্গীদের হিতার্থে আরও কতিপয় ঘটনা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করা হইল।

কেহ কোথায়ও যাইতে হইলে বা কিছু আরম্ভ করিতে হইলে—যে স্থলে শ্রীশ্রীঠাকুর—"না যাওয়াই ভাল, পরে গেলেও হ'তে পারে কিম্বা না করাই ভাল ইত্যাদি ইঙ্গিত করিয়া থাকেন, তখন বুঝিতে হইবে সম্মুখে কোন অন্তরায় আছে। সুতরাং নির্ব্বিচারে

তাহার নির্দ্দেশ মানিয়া চলাই সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলকর। আর তাহা লঙ্ঘন করিয়া চলিলেই বিপদ অনিবার্য্য—ইহা আমরা জানি। তিনি যে ভবিষ্যৎ—দ্রষ্টা বহুক্ষেত্রে এই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহাই এই স্থলে সকলের জ্ঞাতার্থে লেখা গেল।

তাহা প্রায় ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বের কথা। যাজন উদ্দেশ্যে ফরিদপুর রওনা হইব মনে করিয়া আমার বিছানা বাঁধিতে ছিলাম। এমন সময়ে নিবারণচন্দ্র বাগচী আসিয়া সংবাদ দিল—আজ যাওয়া হবে না, শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাকে ডাকিয়াছেন। বিছানা আর বাঁধা হইল না। জিনিষপত্র তদবস্থায় রাখিয়া তখনই আমি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলাম। যে সময়ের এই কথা—তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্ববিজ্ঞানের সংলগ্ন বহির্দ্দিকের যে একতালা বিল্ডিং আছে তাহার পূর্ব্ব প্রান্তের কামরায় থাকিতেন। এই কামরার পশ্চিম পার্শ্বে যে কামরা তাহাতে টাদার অমর লাল বসু ও বসু-মা থাকিতেন। সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ফরিদপুর যাওয়া সম্পর্কে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরাও নির্ব্বিচারে ইহাই নির্দ্দেশ মনে করিয়া যাওয়া স্থগিত রাখিলাম। এদিকে আশ্রম হইতে ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত বাস-সার্ভিসের টিকেট বুক করা ছিল, তাই বাসও আসিয়া ফেরত গেল। সুতরাং টিকেটও বাতিল হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে নিবারণ আসিয়া আবার সংবাদ দিল—শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকিয়াছেন। আমিও নিবারণের সাথে তখনই শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদিগকে তখনই ফরিদপুর রওনা হওয়ার কথা বলিলেন। তদনুসারে আমরাও রওনা হইলাম। টমটম কিংবা অন্য কোন যানবাহন না পাওয়াতে পায়ে হাঁটিয়া পাবনায় যাইতে হইল। তথা হইতে মোটর-সার্ভিসে ঈশ্বরদি গেলাম। ঈশ্বরদি ষ্টেশনে পৌঁছার পরই জানিতে পারিলাম—সকালে যে ট্রেণে যাওয়ার কথা ছিল, সেই ট্রেণ ভেড়ামারা ষ্টেশনে একখানা মালগাড়ীর সহিত টক্কর লাগাতে বহুলোক

আহত হইয়াছে। তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম—শ্রীশ্রীঠাকুর কেন সকালে আমাদের যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন।

অনেকেই জানেন ১৩৪৭ সনের ১৯শে শ্রাবণ রবিবার ইং ১৯৪০ সনের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে মাগুদিয়া ষ্টেশনে ঢাকা হইতে কলিকাতাগামী মেইল ট্রেণের সহিত অপর একখানা ট্রেণের যে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহাতে বহুলোকের প্রাণান্ত ঘটে, অসংখ্য যাত্রী গুরুতররূপে আহত হয়। এই দুর্ঘটনায় আমাদের সৎসঙ্গের তৎকালীন সেক্রেটেরী শ্যামাচরণ মুখার্জ্জি (ডাক নাম গোপাল ভাই) এম, এস-সি, আর ডেপুটী সেক্রেটেরী ডাঃ দুর্গাচরণ সরকার মারা যায়।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে উঁহারা উভয়ে ফরিদপুর গিয়াছিলেন। তথায় রওনা হওয়ার প্রাক্‌কালে শ্রীশ্রীঠাকুর উঁহাদিগকে রবিবার মধ্যে আশ্রমে ফিরিবার কথা বলিয়াছিলেন। আরও সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে অন্য কোথাও না গিয়া সরাসর যেন আশ্রমে আসা হয়। ঐ নির্দ্দেশ মতে উঁহারা ফরিদপুর হইতে আশ্রম উদ্দেশ্যে রওনাও হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন সৎসঙ্গীর সহিত দেখা করিবার জন্য রাজবাড়ী নামিয়া পড়েন। তখন কোন সৎসঙ্গীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কলিকাতা রওনা হইলেন। ইহাই তাঁহাদের ইষ্টাদেশ হইতে বিচ্যুতি, তাহা হইতেই এই প্রকার মৃত্যু।

অপর এক ঘটনার কথা বলিতেছি।—তাহা আমার প্রত্যক্ষীভূত। অনেকবৎসর পূর্ব্বের কথা হিমাইতপুর আশ্রমে বিপুল আয়োজনের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব আরম্ভ হয়। তদুপলক্ষে অভিনয় দেখাইবার জন্য কলিকাতা হইতে বহু পার্টি আসিয়াছিল। তন্মধ্যে ব্যায়ামবীর তারাপদ দত্তের পার্টিও ছিল। তখন তারাপদ দত্তের বয়স তেইশ-চব্বিশের অনধিক। ব্যায়ামবীর বটে, তদনুপাতিক বলিষ্ঠ চেহারা ছিল না। অন্যান্য অভিনয় প্রদর্শন করার শেষে, সে যখন মোটর নিজের দেহের উপর দিয়া চালাইয়া নিয়া ক্রীড়া দেখাইতে উদ্যত হয়, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর অভিনয় দর্শন করার

জন্য নিকটেই ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের এক পার্শ্বে তৎকালীন আনন্দবাজারের সেবক নফরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন আর অপর পার্শ্বে আমি নিজে ছিলাম। তারাপদ দত্ত মোটর অভিনয় দেখাইবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুর নফরদাকে বলিলেন এই অভিনয় না করাই ভাল, ইচ্ছা ক'রে এইপ্রকার danger attempt করা ঠিক নয়। তৎক্ষণাৎ নফরদা গিয়া ঐ কথা তাহাকে জানাইলেন কিন্তু তারাপদ দত্ত তাহা শুনিল না; বরং খেলা দেখাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। যেই মুহূর্ত্তে সে মোটরখানা তাহার দেহের উপর দিয়া চালাইয়া নিতেছিল, তখন দেখিতে পাইলাম শ্রীশ্রীঠাকুরের বদনমণ্ডল ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি যেন এক উৎকট অশান্তি বোধ করিতেছেন। অবশ্য তখনকার মত নিরাপদে ঐ অভিনয় হইয়া গেল বটে। যে কারণেই হউক সে-যাত্রা ঐ ব্যায়ামবীর রক্ষা পাইল। অভিনয়ের পরে ভবিষ্যতে যেন এই প্রকার Attempt করা না হয় এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে হুসিয়ারও করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাহাতে গুরুত্ব দেয় নাই। এই ঘটনার এক বৎসর পরে খবরের কাগজে দেখিতে পাইলাম ব্যায়ামবীর তারাপদ দত্ত মোটর অভিনয় করিতে গিয়াই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া গৌহাটীতে মারা গিয়াছে। তখন আমি রেঙ্গুনে ছিলাম। কামায়ুট সৎসঙ্গ-ভবনে খবরের কাগজ পড়িবার সময়ে ইহা জানিতে পারিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা যখন প্রকাশ করেন, সেই ভঙ্গিমাই আলাদা—তাহাতে বিশেষত্ব থাকে। তাই যাহা যখন তিনি বলেন তাহা বুঝিয়া চলাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলের কারণ।

দ্বিতীয়বার মুক্তাগাছা গিয়াছিলাম মুক্তাগাছা-হরিসভার সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে—তা' ১৩২৮ সনের ফাল্গুনমাসের শেষভাগে দোলপূর্ণিমার সময়ে। উৎসবের কর্ত্তৃপক্ষ বক্তৃতার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। উৎসবের কর্ম্মসূচীতে দেখিতে পাইলাম একাধিক্রমে দুই দিন আমার বক্তৃতার জন্য সময় দেওয়া আছে। অভ্যাগতদিগের জন্য

যদিও পৃথক থাকার বন্দোবস্ত ছিল, আমি ইচ্ছা করিয়াই হেডমাষ্টার সুরেনদার বাসায় ছিলাম। প্রথমদিন সভাস্থলে যাওয়ার পূর্ব্বক্ষণে জমিদার যতীনদা নিজের ট্যাক্সি পাঠাইয়া আমাকে আর সুরেনদাকে তাহার বাড়ীতে নেওয়াইলেন। তৎপরে যতীনদাসহ আমরা সকলে ঐ গাড়ীতেই সভাস্থলে গেলাম। সভাপতি নির্ব্বাচনের পরেই মঙ্গলাচরণ হইল, তৎপরেই আমার বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—উপাসনার বিভিন্ন পদ্ধতি। এই সভায় একজন বাঙ্গালী সাধু উপস্থিত ছিলেন, তাহাকে সকলে ব্রহ্মচারী বলিয়া ডাকিত। বক্তৃতা শেষ হইলে পরে ঐ ব্রহ্মচারী যে সমস্ত তর্ক উপস্থিত করিলেন আর তৎসহ তাহার যেরূপ হাবভাব দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্ট মনে হইল তিনি যেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আসিয়াছেন। উপস্থিত সকলের বাধার দরুণ ঐ দিন তিনি আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

পরদিন প্রাতে অপরিচিত এক ভদ্রলোক আমার সাথে কথাবার্ত্তা বলার জন্য মাষ্টার সুরেনদার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রকাশ করিলেন—তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে সৎসঙ্গের দীক্ষা নিয়াছে। এখনও ছেলের সহিত দেখা হয় নাই। তিনি শুনিয়াছেন— সৎসঙ্গীরা দেব-দেবীর-অর্চনা করে না, এমন কি পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধও তাহাদের নিকট বিধি-বহির্ভূত। তদুত্তরে আমি তাহাকে জানাইলাম— গতকল্য এই বাসায় সুরেনদার স্ত্রীর সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধ হইয়াছে, পুরোহিত দ্বারা যথাবিধি দানের উপকরণ-সহ শ্রাদ্ধকার্য্য করা হইয়াছে। তদুপলক্ষ্যে সদক্ষিণায় ব্রাহ্মণ-ভোজনও হইয়াছে। পুরোহিত ঠাকুরের সহিত আলাপ করিলেই সত্য-মিথ্যা সব জানিতে পারিবেন। তখন ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রকাশ করিলেন শ্রাদ্ধের সব খবর তিনি জানেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে আরো বলা হইল—তাহা হ'লেই ভেবে দেখুন আপনি সৎসঙ্গীদিগের সম্পর্কে যাহা শুনিয়াছেন সমস্তই মিথ্যা রটনা মাত্র। অতঃপর হরিসভায়

আমার যে বক্তৃতা আছে জানাইয়া সভাতে যাওয়ার অনুরোধ করা হইল। অনন্তর বৃদ্ধ চলিয়া গেলেন। সুরেনদার নিকট হইতে জানিতে পারিলাম মুক্তাগাছার সৎসঙ্গী জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতা এই বৃদ্ধব্যক্তি।

সন্ধ্যার পরে সভামণ্ডপে যথাসময়ে আমার বক্তৃতা আরম্ভ হইল। যতীনদা, সুরেনদা, সত্যেনদা, ডাঃ রেবতীরমণ সেন আরও অন্যান্য সৎসঙ্গীগণ আমার বক্তৃতা শোনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে জ্ঞানদার বৃদ্ধ পিতাকেও দেখিলাম। বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বে আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত এক পরমাত্মার বিকাশ—এই বলিয়া সকলের প্রতি আমার নতি জানাইলাম। তৎপর বক্তৃতা আরম্ভ করিতেই পূর্ব্বকথিত ব্রহ্মচারী আমাকে মিথ্যাবাদী, ভীরু ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়া এক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি করিলেন। তিনি আমাকে এই বলিয়া আক্রমণ করিলেন—পূর্ব্বদিন বলা হইয়াছে—"শিলা ও প্রস্তরমূর্ত্তি ওসব কিছুই নয়—আজ আবার ভয়ে ভয়ে ঐ সকলের প্রতি আস্থা দেখান হইতেছে"। তাহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া উপস্থিত অনেকেই তাহাকে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। সভার শালিনতা নষ্ট করিয়া তিনি যে এইপ্রকার অপবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাকে ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী হইলেন না বরং শ্লেষের সহিত এই উক্তি করিলেন—সন্ন্যাসীর গৃহীর কাছে ক্ষমা? তা' কিছুতেই হইতে পারে না। এই উক্তিতে সভাস্থিত সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তদ্দরুন এমন এক গোলমালের সৃষ্টি হইল যেন সভা ভঙ্গ হইয়া যায়। সেই মুহূর্ত্তেই আমি ব্রহ্মচারীর জন্য সকলের নিকট সানুনয়ে ক্ষমা চাহিলাম। তখন সকলে নিরস্ত হইলেন। ইহাতে আমারও বক্তৃতা করার উত্তম সুযোগ হইল। ঐ দিনের বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—বীজতত্ত্ব ও মন্ত্রেরচৈতন্য। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে আমি যখন মঞ্চ হইতে নামিয়া আসিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময়ে ঐ ব্রহ্মচারী একটু নরম স্বরে ভদ্রোচিতভাবে আমাকে বলিলেন—আপনি প্রচারক,

দীক্ষাও দিয়া থাকেন শুনিয়াছি, আপনি-গীতা ভাগবত বিষয়ে নিশ্চয়ই পরম-বিজ্ঞ। আপনার নিকট হইতে গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের—

উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি। অকস্মাৎ এই প্রশ্ন শুনিয়া সভার কেহ কেহ এরূপ আপত্তি করিলেন—এখন তিনি ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে উত্তর হওয়াই ভাল। আবার কেহ কেহ বলিলেন—যখন প্রশ্ন হইয়াছে, উত্তর এখন হওয়াই শ্রেয়। আচম্বিতে এইরূপ প্রশ্ন করাতে আমিও অপ্রতিভ হইয়া গেলাম। আর বুঝিতে পারিলাম আমাকে ঠেকাইবার জন্যই এই প্রশ্ন। তখনই আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক দুই মিনিটকাল একান্ত হইয়া ইষ্ট-চরণে এই নিবেদন জানাইলাম—আমার সমস্ত পৌরুষ তুমি, আমি তোমার বার্ত্তাবহ মাত্র, জয়পরাজয় সবই তোমার!

এই চিন্তার সাথে সাথে মস্তিষ্কের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া পাওয়া গেল। অভাবনীয়ভাবে মানসপটে শ্লোকের অর্থ ফুটিয়া উঠিতে থাকিল, আর আমি অনর্গল বলিতে থাকিলাম—উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্—এই বাক্যদ্বারা মানবদেহই যে সেই বৃক্ষ ইহাই প্রতিপন্ন করে। দেহকাণ্ডের মূল—মস্তিষ্ক, উর্দ্ধদেশে অবস্থিত, ওখানেই চৈতন্যের আবস্থান। আর হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধোদিকে, তাই—অধঃশাখম্ বলা হ'য়েছে। দেহকাণ্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল—তাই উহাকে অশ্বত্থ বলা হ'য়েছে, আর দেহের কারণস্বরূপ—যিনি দেহী, তিনি নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়—হ্রাস-বৃদ্ধি কোন প্রকার ব্যতিক্রম তা'তে নাই, তাই অব্যয়। চির-চৈতন্যময় তিনিই সর্ব্বত্র প্রকাশমান এবং সমগ্র জীবনের উৎস। এই চৈতন্যই আদিতে শব্দান্বিত হ'য়ে অর্থাৎ অনাহত নাদরূপে প্রকটিত হ'য়ে বিভিন্ন ছন্দে বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগতের উৎপত্তি,

স্থিতি ও ব্যাপ্তির একমাত্র হেতু, তাই ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি অর্থাৎ বিভিন্ন নাদই তাহার পত্রপল্লব। নিম্নগ-পরগ দ্বারা যিনি চৈতন্যের এই দ্বিবিধ অবস্থা অর্থাৎ দেহ ও দেহীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাৎপর্য্যের সহিত সম্যক্ পরিজ্ঞাত, তিনিই বেদবিৎ, তিনিই আত্মতত্ত্বজ্ঞ। জীবন্ত সদ্গুরুর আশ্রয়ে থেকে সাধনা দ্বারা এই প্রাণধারার মূলউৎসের সংবাদ যাঁ'রাই পে'য়েছেন, তাঁ'রাই জানেন এই নাদধারাই বাস্তবে সৃষ্টির মূল-কারণ। সদ্গুরুর কৃপা লাভে জীবনধারা ঊর্দ্ধগামী হ'লেই এই নাদ প্রত্যক্ষ ভাবে শ্রুত হ'য়ে থাকে, আর সাথে সাথে মস্তিষ্কের কোষগুলি অতিশয় সাড়া-প্রবণ ও সাড়া—গ্রহক্ষম হ'য়ে উঠে। তৎসঙ্গে সৃষ্টি সম্বন্ধে জ্ঞান গভীর তাৎপর্য্যের সহিত বোধোদ্দীপ্ত হ'তে থাকে। এইজন্য গীতায় টীকাকারগণ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়ে অনেক স্থলে—সদ্গুরুর উপদেশগম্য—এই কথা বলে গে'ছেন। তাহাদের এই উক্তি বাস্তবেই সত্য। *

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া সভাস্থিত বেশীর ভাগ লোকই আমার সাহচুলে মত প্রকাশ করিলেন এবং হাত তালি দিয়া কেহ কেহ হর্ষ প্রকাশও করিলেন। অতঃপর গীতা, তন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে উত্থাপিত অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করা হইল। জমিদারগণের গুরুপুত্র যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যও সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও ব্যক্তিগতভাবে আমার সপক্ষে তাঁহার নিজমত প্রকাশ করিলেন। এই সময়েই তাহার বাড়ীতে আগামী দিন যাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিলেন। পরদিন তিনি লোক পাঠাইয়া আমাকে বাড়ীতে নেওয়াইয়া ছিলেন। এই "সৎমন্ত্র" তিনি গ্রহণও করিয়াছিলেন। ঐ সময়েই জমিদার তারকদাস আচার্য্য চৌধুরী আর তাহার এক ভাগিনেয় দীক্ষা নন।

*এই ব্যাখ্যা মৎকৃত "চরম-যুগধর্ম্ম" নামক পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। ঐ পুস্তক বাং ১৩৩১ সালে মুদ্রিত। ঐ পুস্তকের প্রকাশকও মুক্তাগাছার হেডমাষ্টার সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

অকস্মাৎ কি ভাবে কি হইল আমিও বিস্মিত হইয়া গেলাম। মুক্তাগাছা হইতে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে কৌতুহল নিবারণার্থ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সমস্ত কথা বলা হইল। তাহাতে তিনি এই মাত্র বলিলেন একান্ত যুক্তাবস্থায় যা' করা যায়, তাই আশ্চর্য্যবৎ হ'য়ে থাকে। তখনই শ্রীশ্রীঠাকুর অস্ফুট কোমল-কণ্ঠে গাহিয়া গেলেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরীম্।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এইপ্রকার আনন্দসূচক বাণী পাইয়া আমিও অতিশয় উদ্দীপ্ত হইলাম।

জামালপুর সদর—

প্রথম যাত্রা মুক্তাগাছা হইতেই জামালপুর গিয়াছিলাম। তথায় কোন পরিচিত লোক ছিল না সুতরাং সিংজানি জংসনে নাবিয়াই বরাবর ষ্টেশন মাষ্টারের কামরায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া সাথে সাথে তথায় যাওয়ার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হইল। অতঃপর বিছানা ও স্যুটকেশ তাহার জিম্বায় রাখিয়া টাউনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। চলার সাথে সাথে রাস্তার পার্শ্বস্থিত বাড়ীগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিলাম। যদি দৈবাৎ কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা ঘটে এই হইল উদ্দেশ্য। অনেক দূর গিয়াও যখন কোন পরিচিত লোক পাওয়া গেল না তখন নিরুপায় হইয়া এক কারবারের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলাম। উহার মালিকের সাথে দেখা করিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া আগে তাহাকে সন্তুষ্ট করিলাম। তাহাতে এই সুযোগ হইল—তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার কারবার স্থানের একটি গৃহে আমার থাকার ও রান্না করার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখনই ষ্টেশন হইতে আমার বিছানাপত্র ও স্যুটকেশ নিয়া আসিলাম।
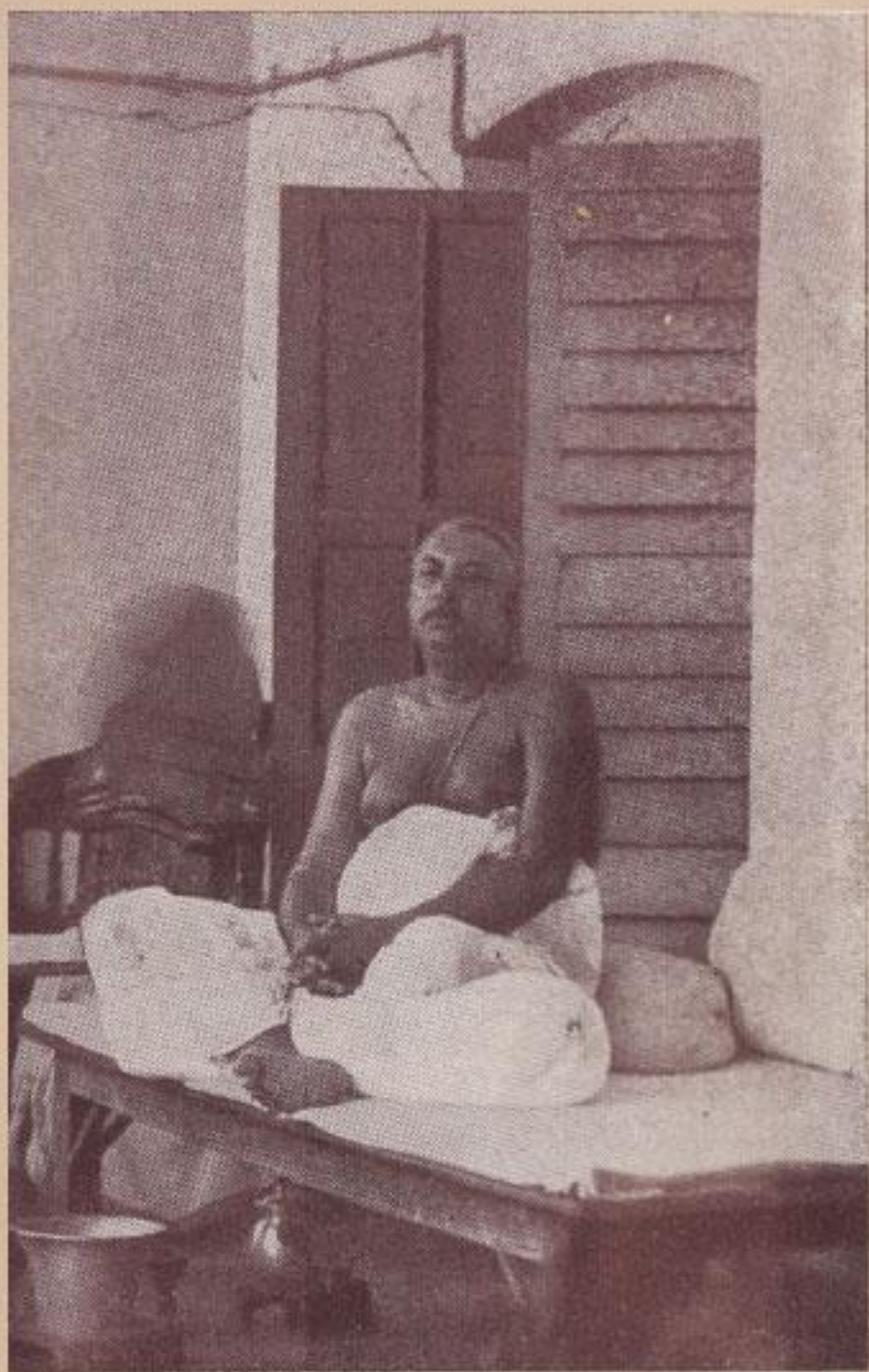
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করিয়া আহারের অব্যবহিত পরেই হাইস্কুলে গিয়া হেডমাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তখনই স্কুলে বক্তৃতা করার সব ব্যবস্থা করা হইল। পূর্ব্বের ন্যায় এইখানেও বক্তৃতা ও প্র্যাক্টিক্যাল দেখান হইল। অনন্তর মাষ্টার ও ছাত্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুসন্ধিৎসু হইয়া কোথায় আমি উঠিয়াছি জানিয়া নিলেন। সন্ধ্যার পরে কেহ কেহ আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎও করিলেন। এই সময়েই নিবারণচন্দ্র বাগচী দীক্ষা লয়। সে তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। নিবারণের দেখা দেখি আরও কয়েকজন ছাত্রও সেই সময়ে নাম নিয়াছিল। ইহার মধ্যে হরেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে জামালপুর টাউনে অধিবেশন-কেন্দ্র অবধি সৎসঙ্গের অন্যান্য যে সমস্ত কাজ হইয়াছিল, তাহার মূলে নিবারণ ও হরেনের সমবেত চেষ্টা ও আপ্রাণতা।

(অপরাংশ দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে)

—পুস্তক প্রাপ্তির স্থান—

গ্রন্থকার—
লক্ষ্মীকুটীর—পুরন্দহ,
বৈদ্যনাথ—দেওঘর।

নির্ম্মল চট্টোপাধ্যায়
বুকষ্টল—সৎসঙ্গ গেষ্ট হাউস,
দেওঘর।

শ্রীগোপেন্দ্রসুন্দর রায়
অশোক আশ্রম,
বৈদ্যনাথ—দেওঘর।

ডাঃ প্রমোদকুমার চক্রবর্ত্তী
নিও-কেমিক্যাল ওয়ার্কস
১০এ, কাশীমিত্রঘাট ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৩

শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
প্রতিঋত্বিক
শাখা-সৎসঙ্গ—নবদ্বীপধাম।

৬। প্রভাত চন্দ্র দে
প্রতিঋত্বিক,
আসাম।

৭। সৎসঙ্গ মন্দির
৪০নং বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

৮। সৎসঙ্গবাড়ী
৬৪নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

৯। নারায়ণচন্দ্র কর্ম্মকার
আর্য্যশ্রী জুয়েলারী
বি সি, রোড, বর্দ্ধমান।

১০। সুধীর কুমার সাহা
প্রতিঋত্বিক,
খগেন বসু লজ, ধনিয়াপাড়া
ব্যারাকপুর।